শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা

প্রাপ্তিস্থান:

এম, সি, সরকার এণ্ড সনস্, (প্রাইভেট) লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ: আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রকাশক:
যতীন্দ্রমোহন মজুমদার
সম্পাদক, শ্যামাপ্রসাদ ফাউণ্ডেশন
৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড্
কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর:
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সারকুলার রোড্
কলিকাতা-৯

দাম—২৲

গ্রন্থ-পরিচয়

নিবেদন

শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাঙলা রচনাবলীর কিয়দংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই লেখাগুলির মধ্যে বর্তমানে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অভাবগ্রস্ত বাঙালী জাতিকে উপলক্ষ করিয়া অনেক আশার কথা আছে। তাঁহার মতে, ভারতের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে ভারতের নিজস্ব ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাহিত্যকে বলশালী করিতে হইবে। দুঃখে এবং অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। কারণ "দুঃখই শক্তির উৎস, দুঃখই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।" নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহার এই বাণী সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে মনে করিয়া আমরা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

বিভাস রায়চৌধুরী
সম্পাদক

ভূমিকা

শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনার সংগ্রহ এই গ্রন্থ। এর মধ্যে বেশীর ভাগ নানা সময়ে ও সভায় তাঁর অভিভাষণ। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নিবন্ধটি তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত, যা ঐ মন্বন্তরের কালেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাঙলার রঙ্গালয়' প্রবন্ধটি শ্যামাপ্রসাদের এম্-এ পরীক্ষার থিসিসের অনুবাদ। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের 'দি ক্যালকাটা রিভিউ'তে লেখাটি ছাপা হয়।

শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ও তাঁর একাগ্র নিরলস কর্মজীবন দেশের গৌরবের বস্তু। শক্তি ও কর্মোদ্যমের মধ্যাহ্নে স্বাধীন ভারতবর্ষে এই দেশকর্মীর রাজবন্দীদশায় মৃত্যুর শোক দেশের মনে অনির্বাণ রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের স্পর্শ যাতে আছে দেশের লোকের তা প্রিয়। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের গতির বেগে স্পন্দমান।

শ্যামাপ্রসাদ সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন বিচিত্র কর্মের নিষ্ঠাবান প্রবল কর্মী। এবং সে সকলরকম কর্মের উৎস ছিল তাঁর দেশপ্রীতি ও দেশকে বড় করার সংকল্প। সেই কারণে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কপালকুণ্ডলা'র বঙ্কিমের চেয়ে 'বন্দে মাতরম্'-এর বঙ্কিম তাঁর মনে উজ্জ্বলতর ছিল। "সত্য সত্যই দেশমাতাকে তিনি সকল দেবতার উপর আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব সাহিত্য-সম্পদ্ লাভ করিয়াছি, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাপ্রসূত হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সে প্রতিভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির প্রভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল।" শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে মানুষের জন্য বেদনাবোধই তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল। "ব্যথিতের জন্য এত অধিক বেদনাবোধ ছিল বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে তিনি মমতার ধারা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই অমৃতধারার আস্বাদন-সুখ যাহারা উপভোগ করিয়াছে, তাহারা শরৎচন্দ্রকে কখনও ভুলিতে পারে না।"

শ্যামাপ্রসাদের প্রবল ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকতার ছদ্মবেশ কখনও পরে নাই। তাঁর নিজের অনুভূতিকে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

ইংরেজীতে যাকে বলে statesman তার শ্রেষ্ঠ রূপটি শ্যামাপ্রসাদের এই লেখাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। যাঁরা statesman তাঁরা কাজ করেন রাষ্ট্র ও সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য। সেই পরিবর্তনের আদর্শ তাঁদের নিজের আবিষ্কার নয়। যে চিন্তা ও ভাবের উপর তার প্রতিষ্ঠা তার জন্ম দেয় অন্য শ্রেণীর লোক, চিন্তা ও ভাবের যাঁরা স্রষ্টা। যাঁরা বড় statesman এই চিন্তা ও ভাব তাঁদের কাজের প্রেরণা দেয়। এই চিন্তা ও ভাবের আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজে তাঁরা বাস্তবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বাঙলা দেশে ও ভারতবর্ষে আধুনিক কালের চিন্তানায়কদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তায় যা সব শ্রেষ্ঠ দান, শ্যামাপ্রসাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেগুলি অনুপ্রবিষ্ট। এই লেখাগুলি তার বড় প্রমাণ। এবং এই লেখাগুলিই প্রমাণ যে, সে চিন্তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তবের রূপদক্ষ কর্মীর মন দিয়ে। দেশের দুর্ভাগ্য তাঁর অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষ এই statesmanship-এর পরিণতির ফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের কিছু লোকের মধ্যে উদ্ধত স্বদেশীয়ানার একটা আত্মকৃত কূপমণ্ডূকত্ব দেখা দিয়েছে। এ রকম এক মনোভাবের সমালোচনায় শ্যামাপ্রসাদের লেখা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি। ১৩৫৫ সালের দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ থেকে।

"......জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নতা এবং সংকীর্ণতাই মৃত্যু। সমস্ত পৃথিবীতে জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে যোগস্থাপনেই জীবন এবং অগ্রগতি। পিছনে থাকিয়া স্বদেশের সংস্কৃতিকে বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলে আমরা শুধু অচলায়তনই গড়িয়া তুলিব। তাই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি অব্যাহত রাখিতে হইলে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বিদেশের ভাবধারায়ও অবগাহন করিতে হইবে। এই জন্যই বাঙালীকে এখন পূর্বাপেক্ষাও অধিকভাবে ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচয় রাখিতে হইবে। এতকাল

ভারতীয়দের ইংরেজী শিখিতে হইয়াছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল বলিয়া, কিন্তু বাঙালী ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য আত্মস্থ করিয়াছে তাহার সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যের জন্য। শুধু চাকরির প্রয়োজনে যে শিক্ষার দরকার ছিল বাঙালী তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়াছে এবং সে শিক্ষাকে আনন্দে পরিণত করিয়াছে। আজ চাকরির প্রয়োজনে ইংরেজীর মূল্য কমিলেও বাঙালী-প্রতিভার নিকট বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য এবং প্রয়োজন কমিতে পারে না। পশ্চিমে যে দ্বার একদিন খুলিয়া গিয়াছিল সে দ্বার যদি আরও প্রসারিত করিতে না পারি তবে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়?”

কথা নূতন নয়। বিশেষ বাঙলা দেশে। কিন্তু ভাবুকের ভাব যখন কর্মবীরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন মনে আনন্দ ও আশা জাগে। কিন্তু এ দুঃখও মনে চেপে রাখা যায় না যে স্বাধীন ভারতবর্ষকে বিদ্যা ও জ্ঞানের এই আদর্শে গড়ে ওঠার সুযোগ-সুবিধার কাজে শ্যামাপ্রসাদ হাত দিয়ে যেতে পারলেন না।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আষাঢ়, ১৩৬৩



বঙ্কিমচন্দ্র

চুয়াল্লিশ বৎসর হইল, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গমাতার অংক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্ত কালস্রোতের বক্ষে এই চুয়াল্লিশ বৎসর সময়কে সামান্য জলবুদ্বুদ-স্বরূপ মনে করিলেও বোধহয় অসঙ্গত হয় না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন—"বৎসরে কি কালের মাপ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।"(১)

বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আমাদের যে অভাববোধ—তাহার পরিমাপ বৎসর-গণনার দ্বারা নিরূপিত হয় না। তাঁহার 'প্রতিভা-উৎসের ভাব-প্রবাহিণী হইতে বাঙালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত' হইয়াছে, এ কথা কখনও ভুলিবার নহে। তাই আজ মনে হইতেছে, যেন কত চুয়াল্লিশ বৎসর গত হইল, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি। তাই আজ তাঁহার শততম জন্মবার্ষিকী(২) উপলক্ষে বাংলার বহু স্থানেই তাঁহার স্মৃতিপূজার উৎসব আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে।

যে সাহিত্য মানুষ গড়ে, সেই সাহিত্যই তিনি গড়িয়া গিয়াছেন। "স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত"—ইহাই ছিল তাঁহার মর্মোক্তি। গঙ্গা হিন্দুমাত্রেরই নিকট পরমপূজ্যা দেবীবিশেষ। তাঁহার 'ইন্দিরা'তেও আছে "গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী"। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ করিতে গিয়া তিনি সেই গঙ্গার উদ্দেশ্যে নিঃসঙ্কোচেই বলিয়াছেন—"তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়?" সত্য সত্যই দেশমাতাকে তিনি সকল দেবতার উপর আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব সাহিত্য-সম্পদ্ লাভ

(১) চন্দ্রশেখর।

(২) জুন, ১৯৩৮ খ্রীঃ।

করিয়াছি, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাপ্রসূত হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সে প্রতিভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির প্রভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার বঙ্গদর্শনের(৩) স্রষ্টা, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

"বঙ্গদর্শন বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা স্বতঃই স্মরণ-পথে উদিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যাতেই তিনি 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দেন যে, "মধ্যকালে যাহা ভারতকলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষ্ম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে, তাহাই ভারতগৌরব।"

'বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এত অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষিত বাঙালীর উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এই উপদেশবাণী—"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর।"—নানা প্রকারে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব। তাঁহার গৌরবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ গর্ব ও গৌরব প্রকাশের অধিকারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সর্বপ্রথম এণ্ট্রান্স্ ও বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়, তখন এই উভয় পরীক্ষারই উত্তীর্ণ ছাত্র তালিকায় তাঁহার নাম আমরা দেখিতে পাই। তারপর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যতকাল তিনি জীবিত ছিলেন, ততকাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার কল্যাণসাধনের জন্য যত্ন ও শ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার তৈলচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্ষে সাদরে স্থাপিত রহিয়াছে। তাই তাঁহার শততম বার্ষিকী উপলক্ষে বাঙলার ছাত্র সম্প্রদায়কে উপহার দিবার উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আজ এই 'বঙ্কিম পরিচয়' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ছাত্রগণের

(৩) বঙ্গদর্শন—বঙ্কিম-সম্পাদিত মাসিকপত্র। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭২ খ্রীঃ।

পাঠোপযোগী রচনামৃত ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "কবিতা দর্পণমাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।"(৪) তাঁহার রচনা কবিতা না হইলেও সে রচনার ভিতর তাঁহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলার যুবক সম্প্রদায় যদি এই পুস্তক মধ্যে তাঁহার ছায়া দেখিয়া তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইল, বিবেচনা করিব।(৫)

(৪) ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব।

(৫) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বঙ্কিম-পরিচয়" নাম দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ তাহারই ভূমিকাস্বরূপ মুদ্রিত হয়।

শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র*

আজ দুই জন যশস্বী ও প্রতিভাশালী বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য এখানে আমরা মিলিত হইয়াছি। ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র, এই দেবানন্দপুর(১) গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে, তাঁহার জন্ম-দিবসের এক উৎসব-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসবো না।...কেবল প্রার্থনা করি, সেদিনও যেন এমনিধারা স্নেহের আয়োজন থেমে না যায়।" এ প্রার্থনা শরৎচন্দ্রের সরলতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার দেশবাসীর প্রতি এ প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে শরৎচন্দ্র যে রত্নরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। বাঙালী বিস্মৃতি-প্রবণ হইলেও যতকাল বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততকাল তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার আয়োজন থামিবে না—থামিবার নহে।

তবে মর্মান্তিক দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ৩১শে ভাদ্র—যে দিন তিনি আর আমাদের মধ্যে আসিবেন না বলিয়াছিলেন, সেই শোচনীয় দুর্দিন যে এত শীঘ্র(২) আসিয়া তাঁহার কথা আজ আমাদিগকে ব্যথার সহিত স্মরণ করাইবে, এ কথা স্বপ্নেও কেহ মনে করেন নাই। বাঙলার দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া

* ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের স্মৃতি-ফলক স্থাপনার উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

(১) দেবানন্দপুর হুগলী জেলার একটি গ্রাম। ই, আই, আর-এর ব্যাণ্ডেল রেল-স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত, শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি। ভারতচন্দ্র এই গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

(২) ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ রবিবার কলিকাতা, পার্ক নার্শিং হোমে মৃত্যু।

অকস্মাৎ তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। তিনি যাহা দিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা দিতে পারিলেন না—বঙ্গসাহিত্য তাঁহার শুভ-সংকল্পিত সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে যাঁহারা অভূতপূর্ব শ্রীসম্পদে ভূষিত করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। চিত্রাঙ্কন-চাতুর্যে ও চরিত্র-বর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলায় আর কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের উদয় ঘটিবার পূর্বে বাঙালী পাঠক যে সুখপাঠ্য কথা-সাহিত্যের অভাব অনুভব করিতেছিল, এমন নহে। তখনও এমন শক্তিশালী লেখক ছিলেন, যাঁহারা নিত্য নূতন গল্প-উপন্যাসাদি রচনার দ্বারা পাঠক-চিত্ত বিনোদন করিতেছিলেন। সাহিত্যের এই জমকালো আসরে আসিয়া নূতন সুরে নূতন করিয়া গান ধরিয়া আসর জমাইয়া পাঠকের চিত্ত জয় করা যে সহজসাধ্য কাজ ছিল, এ কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশঃসৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—যেন তাঁহারই জন্য বাঙলার পাঠক-সমাজ শূন্য সিংহাসন লইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। সগৌরবে ও সসম্মানে তিনি সে আসন অধিকার করিলেন।

শরৎচন্দ্র সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে—পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল—উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেলে না—সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।" শরৎচন্দ্র তাঁহার সাধনার অনুপ্রেরণা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এই কয় ছত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্যথিতের জন্য এত অধিক বেদনা-বোধ ছিল বলিয়াই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে তিনি মমতার ধারা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। এই অমৃত-ধারার আস্বাদন-সুখ যাহারা উপভোগ করিয়াছে, তাহারা শরৎচন্দ্রকে কখনও ভুলিতে পারে না।

শুধু গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি নহে, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। সজীব মানব-চরিত্রই নাটক-উপন্যাসাদির বাহন। তিনি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ভাষায় মানুষের প্রাণের রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শিশু-চরিত্রগুলি পর্যন্ত এই বাক্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

মানুষ-হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার সরলতা ও উদারতার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও অকপট ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হইত এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে আপন করিয়া লইবার তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। একদিকে যেরূপ তিনি স্বল্পভাষী ও কোমল-স্বভাব ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার চিত্ত যথার্থ ভয়শূন্য ছিল। কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার তিনি সহ্য করিতেন না এবং নির্ভীকভাবে আপন মতামত প্রচার করিতেন। বৃহৎ সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না বটে, কিন্তু কোন দেশহিতকর মঙ্গল-কার্যে তাঁহার সহযোগিতা কামনা করিলে নিঃস্বার্থভাবে তিনি উহার সহায়তায় অগ্রসর হইতেন। দেশকে তিনি প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতেন এবং দেশমাতৃকার সেবার সুযোগ পাইলেই নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। বাঙলার দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁহার 'পথের দাবী'র সাহায্যে তাঁহার স্বদেশের যে দাবী জগতের সম্মুখে নির্ভয়ে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আজ বাঙলা সরকারের আদেশক্রমে তাঁহার সেই অতুলনীয় গ্রন্থ বাঙালীর পড়িবার অধিকার নাই।

শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়-কালের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে তাঁহারই এই জন্মভূমি দেবানন্দপুরে আর যে একটি মনীষা-সম্পন্ন বাঙালী (৩) এই গ্রামকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের রচনা-রীতি যেমন বহুদিন যাবৎ বঙ্গীয় লেখককুলের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়াছিল, শরৎচন্দ্রের রচনাও তদ্রূপ হইয়া থাকিবে। ভারতচন্দ্র যেমন পদ্য-সাহিত্যে এক

(৩) ভারতচন্দ্র রায় (বঙ্গাব্দ ১১১৯—১১৬৭) বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পকাল তিনি দেবানন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করেন।

নূতন রূপের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি গদ্য-সাহিত্যে এক অভিনব রূপ দিয়া গিয়াছেন।

এই সভাক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু বলিবার অধিকার আমি পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব-প্রসঙ্গে নূতন করিয়া কিছু বলিবার স্পর্ধা আমার নাই। তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এমনও আমি মনে করি না; কারণ, কালের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমালোচক পৃথিবীতে আর কেহ নাই; সেই কালের বিচারে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতচন্দ্রই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শেষ সর্বপ্রধান কবি। বাস্তবিক, ছন্দের পারিপাট্যে, শব্দ-চয়নের চাতুর্যে ও গল্প-সাজাইবার নৈপুণ্যে তিনি যে শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। তাঁহার রচনা হইতে যত বেশী বাক্যকে বাঙালী প্রবাদবাক্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমন আর কাহারও রচনা হইতে করে না।

দেবানন্দপুর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান না হইলেও ইহার সহিত তাঁহার কর্ম-জীবনের সম্বন্ধ জড়িত হইয়া আছে। ভারতচন্দ্র এই স্থানে অবস্থান করিয়া পারসী ভাষায় বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। ১১৩৪ সালে এই গ্রামে বসিয়াই তিনি তাঁহার প্রথম রচনা সমাপ্ত(৪) করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর লেখনীর মধ্যে আছে—"দেবের আনন্দ-ধাম, দেবানন্দপুর নাম।" বর্তমান কালে দেবানন্দপুর বাঙালীর আনন্দ-ধামে পরিণত হইতে পারিবে কি না, জানি না। কিন্তু কামনা করি—ক্ষুদ্র ও অপ্রসিদ্ধ কাঁটালপাড়া গ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া আজ যেরূপ দেশ-প্রসিদ্ধ ও বাঙালীর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে, শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির সহিত জড়িত এই দেবানন্দপুরও সেইরূপ বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকুক—এখানে প্রতি বৎসর দলে দলে বাঙালী আসিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করুক—বার্ষিক উৎসবে ইহা পরিণত হউক।

এক বৎসর অতীত হইল আমরা শরৎচন্দ্রকে হারাইয়াছি। সেই শোচনীয় দিবস স্মরণ করিয়া তাঁহার ও সেই সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নামে

(৪) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা।

যাঁহারা এই স্থানে দুইখানি মর্ম্মর-ফলক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। আজ যাঁহারা আমাকে এই দুই মনীষীর স্মৃতি-ফলক উন্মোচনের সুযোগ দিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের অবসর দিলেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি বাঙালী ভুলিতে পারে নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরও বাঙলার ইতিহাস চিরদিন মসীচিহ্নিত করিয়া রাখিবে।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লইলেন। দেশে তখন যে অবস্থা চলিতেছিল, তাহা অরাজকতারই নামান্তর। নানা কর্তা—অসংখ্য শাসনবিধি। শোষণ পুরাদস্তুর তো চলিতেই ছিল, তাহার উপর অনাবৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টির দরুন অজন্মা ও শস্যহানি ঘটিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল মন্বন্তর (১৭৭০ অব্দ)। দেশ শ্মশান হইয়া গেল। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কতকটা কৈফিয়ৎ চলিতে পারে,—ইংরেজ যে শাসন-মহিমার জগৎময় ঢক্কা পিটাইয়া থাকে, মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে উহা তখনও দৃঢ়মূল হইবার অবকাশ পায় নাই।

কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) এরূপ কোন কৈফিয়ৎ চলিতে পারে না। পৌনে দুই শত বৎসরের অধিককাল দোর্দণ্ড প্রতাপে শ্বেত-রাজত্ব চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দী অজস্র সুযোগ-সুবিধা মানুষের হাতে আনিয়া দিয়াছে; বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। এখনও দুধের অভাবে কত ছেলে মায়ের কোলে মরিয়া গেল, ডাস্টবিনে মানুষ পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া উচ্ছিষ্ট খাইল, এ দৃশ্য মাসের পর মাস আমরা চোখে দেখিয়াছি।

বাঙলার অসামরিক সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের বারোটি কারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

(১) ১৯৪২ অব্দে আউশ ফসল ভাল হয় নাই।

(২) ১৯৪২-৪৩ অব্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে।

(৩) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন কম হইয়াছে।

(৪) কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে।

(৫) সরকারের নৌকা-নিয়ন্ত্রণনীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

(৬) সমুদ্রকূল হইতে লোক-অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

(৭) ব্রহ্ম ও আরাকান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা ভিড় জমাইয়াছে।

(৮) শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িয়াছে।

(৯) ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ঘাটতি-পূরণের উপায় হয় নাই।

(১০) অনেক বিমানঘাটি তৈয়ারি হওয়ায় সেই সব জায়গায় চাষ হইতে পারে নাই।

(১১) সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার বেশি খরচ হইয়াছে।

(১২) অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর (১৯৪৩) পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে এক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। সরবরাহ-সচিবের বারো দফার মধ্যে ইহার উল্লেখমাত্র নাই। স্পষ্টত তিনি গৌণ কারণগুলির উপর জোর দিয়া আসল ব্যাপার চাপিয়া গিয়াছেন। সরকার-পক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিসের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগজি-নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন। যাহারা সরকারি কাজ করে, যুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, কলকারখানায় নানাবিধ যুদ্ধদ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি-নোট অজস্র পরিমাণে পাইল; তাহা দিয়া মহাস্ফূর্তিতে জিনিসপত্র কিনিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ লোকই ইহার অনেক পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে; ফাঁপানো-মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিসপত্র তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক না

খাইয়া মরিতে লাগিল। ফাঁপানো-মুদ্রানীতির জন্য ভারত-সরকার তথা ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র দায়ী। এই বিষয়ে খুলিয়া বলিলে সাহস ও সত্য-ভাষণের জন্য সরবরাহ-সচিবকে প্রশংসা করা যাইত।

পার্লামেন্টের বিতর্ক-সভায় মিঃ পেথিক লরেন্স কয়েকটি খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন। 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহা কিনিবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নাই। মুদ্রাস্ফীতিই এই অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয়—একমাত্র ভারত-গভর্ণমেণ্টই দায়ী।' মিঃ অ্যামেরিও আমতা-আমতা করিয়া ইহাতে একরকম সায় দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সমস্যাটি হইতেছে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। জনসাধারণের হাতে কিনিবার মতো টাকা ছিল না, ইহা ঠিক। তাহা হইলে অবস্থাটা আজিকার মতো এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত না।'

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। টাকা থাকিলেই হয় না। অনেকে দিন আনিত, দিন খাইত; জিনিসের ক্রমবর্ধমান দামের সহিত তাহাদের সঙ্গতি তাল রাখিতে পারিল না। নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া এমন অবস্থার লোক প্রভূত পরিমাণে মরিয়াছে। অথচ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছুই হয় নাই; অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গেলে তবে কর্তাদের কিছু টনক নড়িয়াছে।

সরবরাহ-সচিবের হিসাবে অপচয়ের কথাটাও নাই। কৃষক, মধ্যবিত্ত-ক্রেতা, দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আস্ফালন চলিয়াছে; মিঃ অ্যামেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাজারের সব চেয়ে বড় ক্রেতা সরকার; সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিক ও ধনিক-সম্প্রদায়। মজুত খাদ্যের মধ্যে কত যে অপচয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কে দিবে? ব্রহ্ম-সীমান্তে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অপরিমেয় আহার্য নষ্ট হইয়াছে। ভারত-সরকারের সঞ্চিত ময়দা ছোলা ছাতু প্রভৃতির কি পরিমাণ অপচয় হইয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব পাইলে বর্তমান দুর্ভিক্ষের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। কলিকাতায় এ. আর. পি-র আনুকূল্যে শত্রু-বিড়ম্বিতদের জন্য যে

সামান্য পরিমাণ জিনিস মজুত করা হইয়াছিল—তাহাতেও প্রচুর অপচয় ঘটিয়াছিল, এ তথ্য সকলের জানা আছে।

দুর্ভিক্ষ একদিনে আসে নাই। সরবরাহ-সচিবের উল্লিখিত বারো দফার কারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, করাল মন্বন্তর ধীরে ধীরে বাঙলাকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার প্রতিকার-চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার শোচনীয় ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। দেশ-বিদেশের সৈন্য দলে দলে আসিয়া বাঙলাদেশ ভরিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র শত্রুকে বন্দী করিয়া আনা হইল—তাঁহাদের অনেকের বোঝা বাঙলার কাঁধে চাপিল, ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য আশ্রয়াথী আসিয়া জুটিল, কলকারখানায় ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংখ্যাতীত মজুর আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখনও মনে করিতেছেন বাঙলাদেশ অবাধে সকলের অন্ন যোগাইয়া যাইবে, কোন প্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

সৈন্যদের খাদ্য সাধারণ বরাদ্দ হইতে অনেক বেশি। শুধু চাউল নয়—ফলমূল তরি-তরকারি মাছ-ডিম-মাংস প্রভৃতিও তাহাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্রীত হয়। ঐ সব জিনিস দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় চাউলের উপর টান বাড়িয়া গেল। ইহার উপর সরকার আবার সৈন্যদলের জন্য দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সর্বদাই মজুত রাখিতে লাগিলেন। বড় বড় কারখানার মালিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হইয়া মজুর ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্যতের খাদ্য-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সরকার পরোক্ষে ইহাদের সহায়তা করিলেন। জনসাধারণের কথা কেহ ভাবিল না।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো হইল। ধান সরাইলেই তো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা ঐ সঙ্গে লোপ পায় না! খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল। ইহার উপর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণকে আরও ভীতিগ্রস্ত করা হইল। এরূপ ক্ষেত্রে লোকের মনে ভরসা জাগাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করা উচিত। সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিলেন যে সাধারণে সরকারের উপর ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফেলিল। মন্বন্তর দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বর্ণনায় সাহিত্যিক-সুলভ অতিশয়োক্তি কিছুমাত্র নাই। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে একটি দুর্ভিক্ষ-কমিশন বসে। কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আনন্দমঠের বর্ণনা তাহার কোন কোন অংশের হুবহু বাঙলা অনুবাদ। আনন্দমঠের চিত্রের সঙ্গে আজিকার দুরবস্থা মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পরেও দুর্ভিক্ষ অনেকবার হইয়াছে*। ইহার মধ্যে ১৮৭৩-৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে দুই কোটি লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দ্রুততার সহিত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়; তাই সেবার লোকক্ষয় সামান্যই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-দমনে এই একবার মাত্র সরকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ৭৩-৭৪ অব্দের ব্যবস্থা এবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। বরঞ্চ ১৭৭০, ১৭৮৩ ও ১৮৬৬ অব্দে যে অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার ফলে অবস্থা ভয়াবহ হইয়াছিল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে অবিকল তাহাই দেখা যাইতেছে। আজিকার মতো তখন অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক ছিল না, কিন্তু এই একটি বিষয় ছাড়া সকল পারিপার্শ্বিকতা আশ্চর্যরূপ মিলিয়া যায়।

১৭৭০ খৃস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইলে, কর্তৃপক্ষ অমনি 'সৈন্য-মণ্ডলীর ছয়মাসের খোরাকি কিনিয়া গুদামজাত করিবার মতলব করিলেন।' অক্টোবর মাস হইতে দেশে হাহাকার উঠিল; নভেম্বর মাসে 'যাহার দুই এক কাহন হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন।' এই নভেম্বর মাসেই 'কালেক্টর-জেনারেল আশঙ্কা করিলেন, দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।'

১৯৪৩ অব্দের অবস্থা অনুরূপ নয় কি? সরকারি ভাষাই উদ্ধৃত করিতেছি—'দেশরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে সৈন্য-বিভাগের তরফ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-ক্রয় হইল। তাহা ছাড়া 'জরুরী অবস্থার প্রতিষেধ হিসাবেও খাদ্য-ক্রয় করিতে হইয়াছে।'

তখনকার দিনে এই চাউল-মজুতের ব্যাপারে এলাহাবাদ ও

* যথাঃ—১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৮৪-৮৫, ১৮৯১-৯২, ১৮৯৭, ১৯০০ ইত্যাদি।

ফৈজাবাদের বৃটিশ অফিসারের নিকট কোম্পানি চাউল কিনিতে পারেন নাই। এবারেও দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশ হইতে—বিশেষতঃ লাটশাসিত প্রদেশগুলি হইতে—চাউল কিনিতে গিয়া বাঙলা-সরকার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের আমলে সন্দেহ করা হইয়াছে, 'ব্যক্তিগত লাভের কারবার খুব চলিয়াছিল।' কোম্পানির কর্মচারীরা এমন অবস্থা করিয়া তুলিল যে বাজারে চাউল পাইবার উপায় রহিল না। দেশে হাহাকার উঠিল; প্রতিবাদ উঠিতে লাগিল। এমন কি কোম্পানির ডিরেক্টররাও কর্মচারীদের অপকর্ম ও অর্থগৃধ্নুতার অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই।

১৯৪৩ অব্দেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। চারিদিকে প্রচুর কলরব উঠিলে মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিলেন, অন্য প্রদেশের চাউল বাঙলায় বেচিয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে বটে, তবে সেটা গোড়ার দিকটায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখনকার দিনেও অধিক পরিমাণে মাল কেনা ও মজুত করার বিরুদ্ধে হুকুম জারি হইয়াছিল। অন্নাভাবে মানুষ মরিতেছে, তবু অবাধ-রপ্তানি চলিতেছিল। জর্জ টমসনের মতে, 'দুর্ভিক্ষের সময়ে রপ্তানিটা যদি বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে চাউলে কুলাইয়া যাইত অনাহারে মানুষ মরিত না।' এই রপ্তানি কবে শুরু হইয়াছিল জানা যায় নাই; ১৪ই নভেম্বর (১৭৭০) অনেক চেষ্টার পর রপ্তানি বন্ধ করা হয়, ইতিহাসে এই বিবরণ রহিয়াছে।

এবারেও রপ্তানির বিরুদ্ধে অনেক চেঁচামেচি হইয়াছিল; কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্বে ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে রপ্তানি কতক পরিমাণে বন্ধ হইল, একেবারে বন্ধ হয় নাই। এখনও কয়েকটি ব্যাপারে বিদেশে চাউল রপ্তানি হইতে পারিবে, তবে সরকারি হিসাবে উহা মাসিক এক হাজার টনের অধিক হইবে না। সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে-সব কারণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই রপ্তানি-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নাই।

বাঙলাদেশ ১৭৭০ অব্দের ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারে নাই; অভাব লাগিয়াই ছিল। ১৭৮৩ অব্দে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এইবার কর্তৃপক্ষ একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন, জলপথে রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। একটি কমিটি তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর দণ্ডমুণ্ডের চরম ক্ষমতা দেওয়া হইল। নির্দেশ দেওয়া হইল, যদি কোন ব্যবসাদার খাদ্যশস্য গোপনে মজুত করিয়া রাখে, বাজারে আনিয়া ন্যায্য মূল্যে বেচিতে অস্বীকার করে—তবে তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া তো হইবেই, অধিকন্তু তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিবদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরেও এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফল কি হইয়াছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়া তাহা দেখাইয়া গেল। সরকারি আদেশ অবাধে এবং প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে। সরকারও আদেশের পর আদেশ সংশোধন করিয়া চলিয়াছিলেন।

১৭৮৩ অব্দের দুর্ভিক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইয়াছিল, বাঙলা ও বিহার এই দুই প্রদেশের জন্য একটি কায়েমী শস্যাগার তৈয়ারি করিতে হইবে। তদনুযায়ী পাটনায় পাকা-গাঁথনির এক প্রকাণ্ড গোলাঘর নির্মিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা আছে—For the perpetual prevention of famines in India. কিন্তু গোলাঘর চিরদিনই শূন্য রহিয়া গেল, কোনদিন একমুঠা ধান তাহার মধ্যে পড়ে নাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়েও ফুড গ্রেইনস্ কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, একটা কেন্দ্রীয় শস্যাগার তৈয়ারি করিতে। এই শস্যাগারের জন্য পাকা ইমারত তৈয়ারি হইবে কিনা, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাতে কি পরিমাণ শস্য উঠিবে, তাহা দেখিবার বিষয়।

১৮৬৬ অব্দে যে মন্বন্তর ঘটে, উহাকে সাধারণত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বলা হয়। 'সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সমুদ্রে' সমগ্র উড়িষ্যা পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বাঙলাদেশের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উহার ঢেউ আসিয়াছিল। এই মন্বন্তরের কবলে উড়িষ্যার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, আজ বাঙলার অবস্থাও অবিকল সেইরূপ। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন অগণিত অন্নহীন মারা পড়িতেছে. শিয়াল-কুকুর মানুষের শব ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে। সরবরাহ-সচিব অবশ্য বলিতে চাহিয়াছেন, বাঙলার সমস্ত অঞ্চল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ধাপ্পা দিয়া সত্যকে চাপা দেওয়া

যায় না। ১৮৬৬ অব্দের মন্বন্তরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। যদি কোনদিন ১৯৪৩ অব্দের নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ বাহির হয়, দেখা যাইবে সেবারের লোকক্ষয় পূর্ববর্তী সকল মন্বন্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে বিভিন্ন জেলার কালেক্টররা আংশিক অজন্মা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন। কিছু খাজনা মকুব করিবারও কথা হইল। কিন্তু কমিশনারেরা উহা সমর্থন করিলেন না। রেভেনিউ-বোর্ডও এইরূপ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল্ করিয়া দিলেন। বোর্ড এক বিস্তৃত বিবরণীতে বাঙলা-সরকারকে জানাইলেন, ফসল কিছু কম হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাতে ভাবনার কিছু নাই; এই ফসলেই লোকের খাবার কুলাইয়া যাইবে। আগামী বৎসরের জন্য মজুত অবশ্য কম থাকিবে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

১৯৪৩ অব্দেও সেই অবস্থা। ব্রহ্মদেশ বেহাত হইয়া যাইবার পর কথা উঠিল, বৎসরের শেষের দিকে বাঙলায় অন্নাভাব ঘটিতে পারে। কথাটা তুলিলেন, ভারত-সরকারের খুব মোটা মাহিনার এক কর্মচারী। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল, একটা লোকের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় হতভাগ্য ঘাস খাইয়াছে, হজম করিতে পারে নাই। কিন্তু উহারই এক সপ্তাহ পরে (৭ই মে) সরবরাহ-সচিব বলিলেন, 'সংকটের সমাধান অদূরবর্তী'। পরদিন ৮ই মে বলিলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে বাঙলায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে।' তখনকার খাদ্য-বিভাগের বড়কর্তা মেজর জেনারেল উড ১৩ই মে বিস্তর অংক কষিয়া দেখাইলেন, বাঙলায় কোন অভাব নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব মাননীয় আজিজুল হক ১৫ই মে কৃষ্ণনগরে বলিলেন, 'বাঙলায় এখনও চাউলের কমতি হয় নাই'। ৩০শে তারিখেও 'বাঙলার অপ্রচুর খাদ্য রহিয়াছে অথবা আমদানি অপ্রচুর হইতেছে'—একথা সুরাবর্দি সাহেব বলিতে পারেন নাই।

১৮৬৬ অব্দে তখনকার লাট স্যার সিসিল বীডনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন, দেশে প্রকৃত অন্নাভাব হয় নাই; ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য রহিয়াছে, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তাহারা মজুত করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলা-সরকারও বলিলেন, 'বাংলায় যে

পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে তদনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি অসংগত হইয়াছে। মজুত মাল বাজারে বাহির করিতে পারিলেই সংকট দূর হইয়া যাইবে।'

১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসেই চাউল-আমদানির দাবি উঠিয়াছিল। তখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া লোকে ইতস্তত ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, স্থানে স্থানে খাদ্য লুঠ হইতেছে। কিন্তু সরকার প্রত্যাসন্ন সংকট উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ২৮শে মার্চ স্যার আর্থার কটন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরকারকে অবহিত হইতে বলিলেন। এপ্রিল মাসে কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রেভেনিউ-বোর্ডের তখনও সন্দেহ, সত্যই খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে কিনা। ক্রমে চাউল একেবারে অমিল হইয়া গেল। সৈন্য, সরকারি চাকুরিয়া এবং কয়েদিদের জন্যও চাউল মিলে না। তখন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর বাহির হইতে চাউল আমদানির হুকুম দিলেন। সরকারের অকর্মণ্যতায় এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা যায়। এইজন্য দুর্ভিক্ষ-কমিশন রেভেনিউ-বোর্ডকে খুব দোষ দিলেন। ১৮৬৭ অব্দের ১১ই আগস্ট রেভেনিউ-বোর্ড অজস্র ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'সময় মতো কাজে হাত না দেওয়ায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়ায় দুর্দৈব ঘটিয়াছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে আনাড়ি লোক ছিল, দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়াও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। কাজে নামিতে অনেক দেরি হইয়া যাওয়ায় এমন অবস্থা ঘটিল যে শেষে টাকা দিয়াও খাদ্য মিলে নাই।' রেভেনিউ-বোর্ড স্বীকার করিলেন, মিঃ র‍্যাভেন শ'র টেলিগ্রাম পাইয়া তৎক্ষণাৎ যদি কাজে নামা হইত, তাহা হইলে অসংখ্য জীবন রক্ষা পাইত।

১৯৪৩ অব্দের দুর্ভিক্ষের ঠিক এই অবস্থা। আনাড়ি লোকের উপর ভার দিয়া বিস্তর অঘটন ঘটিয়াছে। একজনে একটা কাজের ভার পাইলেন, সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাঁহাকে অন্য বিভাগে চালান করা হইল। বাঙলা ও কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য-সংক্রান্ত কর্মচারীদের এত রদবদল করিয়াছেন যে দ্রুততায় উহার কাছে সিনেমা-ছবিও হার মানিয়া যায়। ১৯৩৯ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য ছয়টি কনফারেন্স করিয়াছেন। ১৯৪২ অব্দের ডিসেম্বরে খাদ্য-বিভাগ সৃষ্ট হয়; ১৯৪২ অব্দের এপ্রিলে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিল হয়। ১৯৪৩ অব্দের

এপ্রিলে রিজিওন্যাল ফুড-কমিশনার নিযুক্ত হন। গড়ে মাস দুয়েক অন্তর পর পর চারি জন ফুড-মেম্বার হইলেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার; বাঙলায় যে কত রকম পট-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই আমরা চোখের উপর দেখিয়াছি।

সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩ অব্দে ঠিক ১৮৬৬ অব্দের মতো অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। টাকা ফেলিলেও চাউল মিলে নাই। চাঁদা তুলিয়া নানা প্রতিষ্ঠান লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিল। সরকার মনে করিলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ হাঙ্গামাটা চুকাইয়া দিবে, তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার গরজ হইবে না। পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে, শহরমুখো ধাওয়া করিয়াছে, কর্তাদের সেদিকে নজর পড়িল না।

অথচ এই অবস্থাই সকলের চেয়ে মারাত্মক। গ্রামের মধ্যে খাদ্য পোঁছাইয়া দিলে লোকের ঘর-গৃহস্থালি খানিকটা বজায় থাকিত, তাহারা কিছু কিছু আয় করিতেও পারিত, যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাবলম্বী হইয়া আবার মাথা তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকিত। দুর্ভিক্ষ গ্রামের মানুষকে তাড়াইয়া শহরে আনে। যে ছিল গৃহস্থ, আত্মসম্মান হারাইয়া সে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭৮ অব্দের দুর্ভিক্ষ-কমিশনে স্যার রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, 'খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যখন ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে, দুর্ভিক্ষে সেই অবস্থা সকলের চেয়ে ভয়াবহ। ইহার ফলে লোক নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রামে শৃঙখলার সহিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র হইবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে।'

১৮৬৬ অব্দেও লোকে ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছিল; ১৯৪৩ অব্দের মতোই সদর রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ পড়িয়া থাকিত। আগস্ট মাসে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেবার বিস্তর লোক মরিয়াছিল। দলে দলে অস্থিসার মানুষ লঙ্গরখানায় জমায়েত হইত। তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল না। সরকার লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের লোক আসিয়া শহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। তখন একরকম জোর করিয়াই শহরের অন্নসত্র বন্ধ করিয়া

দেওয়া হইল; দুঃস্থদের বাহিরে পাঠানো হইল। সত্তর বৎসর পরে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছি। সেবার কলিকাতা শহরে লোক জমিয়াছিল পনের ষোল হাজার। ১৯৪৩ অব্দে সরকারি অনুমান, একলক্ষ।

সেবারও রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। কটকের রিলিফ-ম্যানেজার মিঃ কার্কউডের মতে, এই প্রকার সাহায্য দানে গ্রহীতার নৈতিক অধোগতি হয়। এ কথা ঠিক যে, লোকে রান্না-করা খাদ্য গোপনে বিক্রি করিয়া উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু আর একটা দিক ভাবিবার আছে। বহু পরিবারেরই এইরূপ সাহায্য লইতে ইজ্জতে বাধে, তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ অব্দেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সরকারি তরফ হইতে কি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল?

১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই সরকার অবহিত হইয়াছিলেন, তাই সেবার বেশি লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। খাদ্যের সন্ধানে লোকে গ্রাম ছাড়িবার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পেঁছায়, দেহের শক্তি অবশেষ হইবার আগে যাহাতে কাজ পায়, অতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রার্থী সাহায্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য সকলের চেয়ে প্রামাণ্য। শহরের উপর অন্নসত্র খুলিলে এই প্রমাণের উপায় থাকে না; অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ অধিকাংশ দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পেঁছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এইরকম গোলযোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাড়িতে বসাইয়া নামে নামে এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না করিলে সুশৃঙ্খল সাহায্য অসম্ভব, এই ছিল তাঁহার অভিমত। পঞ্চাশ হইতে একশ'টি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইল; সমগ্র বাঙলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিয়া ফেলা হইল। প্রতি কেন্দ্রে এক একটি বড় শস্যাগার—সেখান হইতে গ্রামের শস্যভাণ্ডারে খাদ্য পাঠান হইত। একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী প্রতি সপ্তাহে কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষ দমনের এই প্রচেষ্টা—সকল দিক দিয়া ইহাকে আদর্শস্থানীয়

বলা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইহা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে।

কিন্তু সেবার এত সুব্যবস্থার মধ্যেও চাউল রপ্তানি হইতেছিল। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১২ই অক্টোবর (১৮৭৩) তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভারত-সরকারকে সতর্ক করিয়া অনুরোধ জানাইলেন যেন—(১) অবিলম্বে সেবাকার্য শুরু করিয়া দেওয়া হয়; (২) বাহির হইতে চাউল আনিবার বন্দোবস্ত হয়; এবং (৩) ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বড়লাট চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে রাজি হইলেন না; সেক্রেটারি অব স্টেটকে তাঁহার আপত্তির বিষয় জানাইলেন। যে-সব ভারতীয় কুলি মরিসস, ওয়েস্টইন্ডিজ, সিংহল ও অন্যান্য দেশে গিয়াছে (বেশির ভাগই ইউরোপীয় বাগিচায় কাজ করিতে) চাউল বন্ধ করিলে তাহাদের উপায় কি? ১৯৪৩ অব্দে অবিকল ইহারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। সিংহলের ভারতীয় কুলি, ভূমধ্যসাগরের ভারতীয় সৈন্য—তাহাদের সকলের ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইয়াছে। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে সুব্যবস্থা যত কিছু হইয়াছিল, কিছুই গ্রহণ করি নাই; কেবল সেবারকার চাউল রপ্তানি নীতিটা বহাল রাখিয়াছিলাম।*

* এই প্রবন্ধ-সংকলনে শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত উপাদানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

শিক্ষা-সম্প্রসারণ

একের সহিত অন্যকে মিলায়, ইহাই সাহিত্যের ধর্ম। যে অজ্ঞানের অন্ধকার মানুষের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সাহিত্যের স্নিগ্ধ আলোকে সে অন্ধকার দূরীভূত হয়। মানুষের সহিত মানুষের মিলনসাধন করিয়াই সাহিত্য ক্ষান্ত হয় না। জাতির সহিত জাত্যন্তরের, দেশের সহিত দেশান্তরের, অতীতের সহিত বর্তমানের এবং বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপন করিয়া সাহিত্য বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মানবকে ঐক্যের সুনিবিড় বন্ধনে সংবদ্ধ করে। যে জাতির নিজস্ব সাহিত্যের অভাব, সে জাতি বিশ্বের কাছে অপরিচিত, এমন কি নিজের কাছেও। আমরা বাঙালী অশেষবিধ ভাগ্যবিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়াও যে একটি মাত্র ঐশ্বর্য লইয়া গর্ব করিতে পারি, সে আমাদের সাহিত্য। একদিন তো আমাদের সবই ছিল। আমাদের অন্নপূর্ণার পূর্ণপাত্র কত বুভুক্ষুর রিক্তথালি পূর্ণ করিয়াছে, আমাদের মহালক্ষ্মীর রত্নপেটিকা কত ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলি মণিমাণিক্যে ভরিয়া দিয়াছে, আমাদের শিল্প-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অতীত গৌরবের পবিত্র পুরাতন দিনগুলি আজ যে বর্তমানের বাস্তব ক্ষেত্রে রূপান্তর লাভ না করিয়া স্মৃতিলোকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে সেজন্য দুঃখ করিতে হয় করিব, কিন্তু আর নির্লজ্জের মত বারংবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব না। কেন গিয়াছে কাহার দোষে গিয়াছে সে কথা আজ আর আমাদের অবিদিত নাই, সুতরাং সে আলোচনা নিষ্ফল। কেমন করিয়া হারানো জিনিস আবার ফিরিয়া পাইব তাহার আলোচনাও আজিকার ক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়, বহু শতাব্দীর বিবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াও আমরা প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলি নাই কেন? রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য,

সর্বোপরি দীর্ঘদিনের পরাধীনতার মনুষ্যত্বনাশী গ্লানিভার বহন করিয়াও প্রাত্যহিকের ঊর্ধ্বে মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য পাই কোথা হইতে? পুঞ্জীভূত অপমানের বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন থাকিয়াও মোহ-ধ্বংসী সূর্যালোকের আভাস দেখিতে পাই কাহার শক্তিতে?—তাহার একমাত্র উত্তর সাহিত্য। জাতির জীবনের মূলে রসধারা জোগাইয়া সাহিত্যই তাহার প্রাণশক্তি অব্যাহত রাখিয়াছে।

বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। কত রাজ-বংশের উত্থান-পতন, কত ধর্মমতের উদয়-বিলয়, কত রীতিনীতির আরম্ভ-পরিণতি, কত চিন্তাধারার আদি-অন্ত লক্ষ্য করিতে করিতে আমাদের এই সাহিত্য আজ প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র পরিচয় বহন করিয়া আসিতেছে। এই সাহিত্যের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়া আমরা পিতৃপিতামহের সহিত সচেতন এবং সজীব মানসিক যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। নানা কারণে সে যোগ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ নাই। অর্থহীন প্রথা, যুক্তিহীন আচার, অমার্জনীয় মূঢ়তা শৈবালদামের মত দল বাঁধিয়া কখনো কখনো স্রোতপথ রুদ্ধ করিয়াছে। আমাদের চৈতন্য জাগরিত হইলে ঐ বাধা অপসারিত করা হয়তো কঠিন হইবে না। কিন্তু একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যেটুকু যোগ আছে তাহা কেবল সাহিত্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

জাতীয় জীবনে জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুকাল বড় উদাসীন ছিলাম। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সেই ঔদাসীন্যটা এক রকম বিরুদ্ধতার ভাবই ধারণ করিয়া বসিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্প্রদায়কে কশাঘাত করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষা-বিরোধী তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিদ্রূপ অত্যন্ত রূঢ় হইলেও ইহার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে কি ভাবে গ্রহণ করা হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না, কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল এই প্রসঙ্গে তাহা স্বভাবতই মনে পড়ে। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ মাতৃভাষার নানাভিমুখী অনুশীলন হইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতেছে। ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি.এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতর অনুশীলনের সুব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল বাঙলাভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি এই মর্যাদা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা অল্পাবিস্তর অনুসৃত হইতেছে। আশা করি এমন একদিন আসিবে যেদিন ভারতের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নতম পাঠ হইতে উচ্চতম গবেষণা পর্যন্ত মাতৃভাষার বাহকতায় সম্পন্ন হইতে পারিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার গুরুত্ব আমরা সব সময় অনুভব করিতে পারি না। কি প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া আমরা এই যে ফললাভ করিয়াছি, তাহা আমরা বিস্মৃত হই। যাঁহারা প্রতিকূল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজদেহে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও বিমাতার অঙ্গনে মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকল্প পূর্বজগণের নাম স্মরণ করিতেছি।

রাজনৈতিক কারণে যদিও দেশের মধ্যে একটা দলাদলির বিষাক্ত আবহাওয়ার উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি অতি বড় নিন্দুকেও বাঙালী জাতিকে অনৌদার্যের অপবাদ দিতে পারিবে না। আমরা সাহিত্যকে জাতিগঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া গণ্য করি। সাহিত্য যেমন জাতির অঙ্গে সঞ্জীবন-রসের সঞ্চার করিয়া জাতিকে সজ্ঞান সচেতন এবং সবল করিয়া তুলে, জাতির সমুদ্বোধিত চৈতন্য, সুগঠিত চিন্তাধারা এবং সুনিয়ত বিচারবুদ্ধি তেমনি মহত্তর সাহিত্য প্রণয়নে সহায়তা করে। বঙ্গদেশের শিক্ষাচার্যগণ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যতঃ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধির সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই সে কথা জানেন। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করাই যে কালে আপত্তির কারণ হইত অন্য ভাষার পঠন-পাঠনের আয়োজন করা সেকালে প্রায় অসম্ভবই

ছিল। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে এম.এ. পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ আমরা লাভ করিতেছি। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্যও পিতৃদেবকে কম প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হয় নাই, কিন্তু দেশকে প্রদেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার মত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন নিজের ভাষা এবং নিজের সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বাঙালী যে কল্যাণ লাভ করিবে, অন্য জাতি সুযোগের অভাবে সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইলে, ক্ষতি শুধু সেই বিশেষ জাতিরই নয়, সে ক্ষতি সমগ্র ভারতবর্ষের। তিনি বুঝিয়াছিলেন সর্ব অঙ্গের সুস্থতার উপর সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধিতে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ-ভারতের তামিল, তেলুগু প্রভৃতিকেও স্থান দিয়াছিলেন। যে ভাষা আপন প্রদেশে অনাদৃত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকেও সমগ্র জাতির মুখ চাহিয়া অনাদর করেন নাই। বাঙলা দেশ তাহার বাণীপীঠ হইতে যে আদর্শ প্রচার করিয়াছে, যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মহাদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, গভীর ঔৎসুক্যের সহিত সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

সাহিত্যের সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ সাহিত্যের সহিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। যাহাকে ভালবাসি তাহার দেহটাকে বাদ দিয়া শুধু আত্মাটির কথা তো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বস্তুতঃ দেহটাকে লইয়াই আমাদের যত কারবার। যে আপনার ভাষাকে ভালবাসে আপনার সাহিত্যের প্রতিও তাহার মমত্ববোধ সহজেই জাগ্রত হয়। আবার উচ্চতর সাহিত্যে রসের উপলব্ধি ঘটিলে তখন ভাষা ও সাহিত্যের প্রাদেশিক গণ্ডি হইতে মন সহজেই মুক্তি লাভ করে। তখন অন্যের ভাষা নিজে পড়িতে এবং নিজের ভাষা অন্যকে পড়াইতে ইচ্ছা হয়। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে এই অবস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু যদি কেহ শিক্ষাদানের মত পুণ্যকর্মকে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, তবে তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। অনেক প্রদেশের প্রান্তসীমায় প্রায়ই এই ধরনের অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। একজন বাঙালী যদি

বাঙলা শিখিয়া তদুপরি হিন্দী ওড়িয়া অথবা তামিল তেলুগু শিখে, তাহা তো আনন্দের কথা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, অন্য প্রদেশের কোনো একটা ভাষা হয়তো শিখিল, কিন্তু মাতৃভাষাটাই শেখা হইল না, তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? দেশকে প্রদেশে বিভক্ত করিবার স্বাভাবিক উপায় হইল ভাষাবিচার,—ধর্মভেদে প্রদেশ ভেদের যে সাম্প্রতিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতির অনুমোদিত নহে। সুতরাং এক প্রদেশের অজ্ঞ নিরক্ষর দরিদ্র মানুষকে সামান্য কিছু প্রলোভন দেখাইয়া যদি তাহাকে অন্য ভাষায় দীক্ষিত করা হয় এবং বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার মনে যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া যায় যে, ঐ অন্য ভাষাই তাহার মাতৃভাষা, তবে এই প্রদেশের আপত্তি করিবার সংগত কারণ থাকিতে পারে। শিক্ষাদানের মত মহৎ কর্তব্য আর কি আছে? যাঁহারা শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির নমস্য। কিন্তু তাঁহারাও যদি এক প্রদেশীয়কে অন্য প্রদেশীয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই শিক্ষাদান করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে সাধু বলিব না। বাঙলা দেশের তরফ হইতে আমরা কি করিতে পারি তাহা দেখিতে হইবে। অন্যে আসিয়া যদি আমার নিরক্ষর ভ্রাতা-ভগিনীকে তাহারই অক্ষর শিখাইতে থাকে, তাহাকে বাধা দিবার কোনো সংগত কারণ নাই। কিন্তু আমার কর্তব্যটা তাহার পূর্বে পালন করিয়া লইতে হইবে। আমার ভাষা তাহাকে আগে শিখাইয়া দিতে হইবে। সে কে, তাহার পূর্বপুরুষের পরিচয় কি, আমার সহিত তাহার এবং তাহার সহিত সমগ্র দেশের সম্বন্ধ কিরূপ— ইহা যদি একবার তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল ভাষার এক এক দল প্রতিনিধি আসিয়া গ্রামে গ্রামে ভাষা শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া দিলেও কোনো ক্ষতি হইবে না, বরং কিছু উপরি লাভ হইবে।

যে কর্তব্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা একজন দুইজনের কাজ নয়। দেশের শিক্ষিত সমাজকে এই কাজের ভার লইতে হইবে। দেশের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যে দেশের লোক অধিকাংশই নিরক্ষর তাহাদের শিক্ষিত করিবার পণ গ্রহণ করিতে পারে তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উৎসাহী কর্মীর অভাব হইবে না, সে ভরসা আমি

দিতে পারি। কিছুকাল আগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আহ্বানমাত্র ছাত্রগণ দলেদলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিখিয়া লইয়া দীর্ঘ অবকাশে আপনআপন গ্রামে গিয়া বয়স্ক নিরক্ষরদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষাদান-কার্য চালাইতে হইলে একটি প্রতিষ্ঠানের শক্তিই যথেষ্ট হইতে পারে না। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য-সমিতি, গ্রন্থাগার-সমিতি প্রভৃতি এই কাজে সহযোগিতা করিলে আমাদেরই অশিক্ষিত ভ্রাতা-ভগিনীরা, যাহারা আজ সমাজের ভারস্বরূপ, তাহারাই সমাজের সুযোগ্য সভ্য বলিয়া গণ্য হইবে। বাঙলাদেশে দুই হাজারের কাছাকাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের সহায়তায় নিরক্ষর দেশবাসীকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যদি অবসর সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে দেশমাতার প্রকৃত সেবা করা হইবে। অর্থের প্রয়োজন সব কাজেই আছে, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস বর্তমানে দেশে জাতীয়তাবোধ যে ভাবে জাগ্রত হইতেছে, তাহাতে কোনো মহৎকার্যই অর্থের অভাবে আটকাইয়া যাইবে না। কাজ আরম্ভ করিলে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা দুর্লভ হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান—যথা, বিশ্বভারতীর অন্তর্গত লোকশিক্ষা-সংসদ, শান্তিপুর পুরাণ-পরিষদ এবং প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অন্তর্গত পরীক্ষা-পরিষদ—ইতিপূর্বেই এ কাজে হাত দিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা আপনআপন কার্যে ব্রতী আছেন, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কি? বস্তুতঃ কি আশা লইয়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আশা কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ স্থলে আমি সবিনয়ে এই কথা বলিতে চাই যে, কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব নহে।

লোকশিক্ষা-সংসদ এবং পরীক্ষা-পরিষদের নিয়মাবলী আমি

যত্নপূর্বক দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ যাঁহাদের ঘটে না বাঙলাদেশের সেই সব নরনারীর মধ্যে বাঙলার মাধ্যমে জ্ঞান-বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের এক পত্র হইতে তাঁহার অভিপ্রায় কি ছিল জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন : "দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোটো বড়ো প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে, তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে, সুবিহিত ভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।" শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—"(ক) প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচয়। (খ) বঙ্গভাষার আভিজাত্য সংরক্ষণ।" এবং তাঁহাদের মতে এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা-পরিষদ দ্বারা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আপাতত বৎসরে একবার মাত্র প্রবেশিকা এবং উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ করা।"

উভয় প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায় একরূপ অভিন্ন। উপায়ও প্রায় সমান। তবে পাঠ্যক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উভয় প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত হইতে হইলে এই পার্থক্য দূর করিতে হইবে। তাহা না হইলে পাঠ্যতালিকার ভেদে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে উদ্দেশ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইলে সর্বতোভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরীক্ষা-গ্রহণের সহিত নিরক্ষর দেশবাসীকে অ আ ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা লেখাপড়া শিখাইবার কোনো সম্বন্ধ নাই। তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা প্রণয়নে ইঁহাদের সাহায্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে।

মাতৃভূমিকে আমরা যদি দেবী বলিয়া—স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া জ্ঞান করি, তবে মাতৃভাষাকেও পরমারাধ্যা বলিয়া জ্ঞান করিব। সৌভাগ্যের কথা, অন্ধভক্তির বশবর্তী হইয়া আমাদের ভাষাকে আরাধনা করিবার

প্রয়োজন হইবে না। বাঙলা ভাষা আজ নিজের ঐশ্বর্যবলে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানীর ন্যায় তাহাকে যদি গণভাষারূপে ব্যবহার করিতে জনসাধারণ অসমর্থ হয়, তবে তাহা লইয়া আক্ষেপ করিব কেন? ভাষার উন্নতি এবং প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কর্তব্য আমরা ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করিব। আমাদের ভাষালক্ষ্মীর মর্যাদা তাহাতেই সমধিক রক্ষিত হইবে। কত লোকে এক একটা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিয়া দেখিলেও পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান সপ্তম এবং ভারতের মধ্যে প্রথম। ইহা বিশেষজ্ঞের মত। আর যদি আদমসুমারির হিসাবের উপর নির্ভর করা যায়, তবে বাঙলার পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম এবং ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান। তাহাও বড় কম গৌরবের কথা নহে। ১৯৪১-এর আদমসুমারিতে ভাষার হিসাব বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হয়তো আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ১৯৪১-এ বাঙলার অধিবাসীর মোট সংখ্যা ছয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ ষাট হাজার তিন শ সাতাত্তর। ১৯৩১-এ মোট অধিবাসীর শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙলা ধরা হইয়াছিল। সেই হিসাবে এবারে বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীর সংখ্যা হওয়া উচিত পাঁচ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ সাতচল্লিশ (৫৬৫,৪৩,৫৪৭)। ইহা ছাড়া বাঙলার বাহিরে আসাম উড়িষ্যা এবং বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী অনেক বাঙালী আছেন, যাঁহারা আজও মাতৃভাষারূপে বাঙলার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় কোটি। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। অন্তত এটুকু আমাদের দেখিতে হইবে, বাঙালীর মধ্যে, তিনি বর্তমানে যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউন না কেন, একজনও যেন বাঙলা ভাষায় অজ্ঞ না থাকেন।

পরম আনন্দের বিষয় যে জামসেদপুর শিক্ষাপ্রচার-সমিতির উদ্যোগে অশিক্ষিত জনসাধারণকে বাঙলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ধূম্রধূলির ঘূর্ণিবাত্যার ঊর্ধ্বেও যাঁহারা জ্ঞানের পবিত্র বহ্নিশিখাটি প্রজ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। সুবর্ণপ্রদীপের সংস্থান না হইয়া থাকে না হইল, তাহার জন্য

আক্ষেপের কোন কারণ নাই। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সংস্পর্শে পিতলের প্রদীপই সোনা হইয়া উঠিবে। সমিতির শিক্ষাদান কার্য সম্ভবত বালকবালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বয়স্কাদিগের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত করা হইয়াছে। যদি এখনও না হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বেই তাহা করা প্রয়োজন। কেবল শিশু অথবা কেবল বয়স্কের মধ্যে শিক্ষাদান আবদ্ধ রাখিলে সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিবে না।

সময়ের মূল্য বর্তমান যুগে অত্যন্ত অধিক। দীর্ঘকাল ধরিয়া পঠনপাঠনের সময় কেহ পাইবে না। যে সম্প্রদায়ের পাঠার্থী লইয়া সমিতির কাজ, তাহাদের অবসর অতি অল্প। এই অল্প সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে কি না, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ছয় মাস বা এক বৎসর শিক্ষা পাইয়া একজন নিরক্ষর লোক সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু মাতৃভাষায় অন্তত এতটা অধিকার অর্জন করা আবশ্যক, যাহাতে সংবাদপত্রটা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এবং নিজের চিঠিটা অন্যকে দিয়া লিখাইতে বাধ্য না হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাধারণ জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে জগতে সে বাস করে, তাহার সম্বন্ধে যেন একেবারে অন্ধ না থাকে। বয়স্ক এবং অল্পবয়স্ক পাঠার্থীর পাঠক্রম এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা একরূপ হইলে চলিবে না। কারণ উভয়ের গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি একরূপ নয়। তাহা ছাড়া একটি ছয় বৎসরের শিশুর কাছে যে পাঠ মনোজ্ঞ হইবে, একজন মধ্যবয়সী শ্রমিকের পক্ষে সেই পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা অল্প। এদিকে চিন্তা করিয়া পাঠ্যনির্ণয় ও পাঠক্রম স্থির করিতে হইবে। বর্তমান আয়োজন অল্প বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই বৃহতের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে।

ভারতবর্ষে শিক্ষা, সভ্যতা এবং স্বাদেশিকতা প্রচারে বাঙালীর দান অসামান্য। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা যে প্রদেশেই গিয়াছেন, সেই প্রদেশকেই স্বদেশ বলিয়া তাহার উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, মহীশূর, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে তাহার সুপ্রচুর নিদর্শন আছে। নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা বাঙালীর জাতীয় ধর্ম, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতর স্বার্থের মোহ কখনো

তাঁহাদিগকে অখণ্ড ভারতের মহত্তর আদর্শের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই তাঁহারা সকলের বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙালীরা চিরকাল ভারতের কথাই চিন্তা করিয়াছেন, প্রদেশের সুখ-সুবিধার ঊর্ধ্বে দেশের স্বাধীনতাকেই তাঁহারা স্থান দিয়াছেন। বিদ্যা বিতরণের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদার সর্বজনীন নীতির উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি।

যে কোনো অবস্থাতেই হউক না কেন, ঐক্য ও অখণ্ডতার সেই বৃহৎ আদর্শ হইতে আমরা কখনোই বিচ্যুত হইব না। সাময়িক স্বার্থের প্রলোভনে চিরন্তন মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইতে দিব না। আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কুটিল রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য সর্বত্রই একবার করিয়া ঘা মারিয়া যাইতেছে। দুর্বল স্থানে তাহা বেশ জোরেই লাগিতেছে। হিন্দীকে বিকৃত করিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে এবং অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে তাহা যে ক্রমশ ব্যাপক এবং বর্ধিত করা হইতেছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। এদিকে লেখ্য হিন্দী ভাষায় উর্দু হরফের ব্যবহার কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায়, ঐ অপচেষ্টার ক্ষেত্র আরও উর্বর হইল। আমরা কি নিশ্চেষ্ট নিরুত্তরে এই অত্যাচার সহ্য করিয়া লইব? বাঙলা ভাষালক্ষ্মীর অঙ্গনেও ভেদনীতির অঙ্কুর বপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে তাহাকে উৎপাটন করিয়া না ফেলিলে বিষবৃক্ষ ডালপালা মেলিয়া সমগ্র দেশকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। বাঙলার এই দুরবস্থা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হিন্দু-মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালী হয়ে বাঙলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা,

সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না।"

যে অশিক্ষিত অবুদ্ধি আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙিবার চেষ্টায় রত, তাহাকে দূরীভূত করিবার সর্বপ্রধান উপায় দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশকে সহজে শিক্ষিত করা সম্ভব। আপন প্রাদেশিক ভাষায় আপন প্রদেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্নগুলি তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। স্ব-দেশকে, স্ব-জাতিকে, আপনার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানিবার এবং শ্রদ্ধা করিবার শিক্ষা পাইয়া জনগণ ধন্য হইবে। জাতীয় উন্নতির ইহাই প্রথম ও প্রধান সোপান।

সাহিত্যের প্রচার শুধু প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক ভাষার গ্রন্থ অন্যভাষী পাঠকের পঠনযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরকে চিনিবার জন্য, পরস্পরের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া আপনআপন মত গঠন, বর্জন অথবা সংশোধন করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর উপায়ের কথা তো আমি ভাবিয়া পাই না।

এইখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, এক ভাষার গ্রন্থ অন্যভাষীর পঠন-যোগ্য করা কি ভাবে সম্ভব হইবে? এক উপায় আছে অনুবাদ এবং সে উপায় বহু বৎসর পূর্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বহু বাঙালী সাহিত্যিকের রচনাসমূহ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষাতেও অন্যান্য ভাষার অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে শুনিয়া কৌতূহল বোধ করিবেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দী "বেতাল পচিসী"র অনুবাদ। প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলা ভাষায় অন্য প্রদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি আলাওলের রচিত পদ্মাবতী নামক কাব্যখানির নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। এই কাব্যখানি মালিক মুহম্মদ জৈসীর হিন্দী কাব্য "পদ্মাবৎ" অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের ধারা, কখনও বা আক্ষরিক অনুবাদ কখনও বা ভাবানুবাদ, আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থ নানা কারণে যথেষ্ট পরিমাণে

প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় না। উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব তাহার অন্যতম। অনুবাদ করিতে গেলে উভয় ভাষায় সমান জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ভাষান্তর করিতে গেলে অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পক্ষেও মূলের ভাব এবং রস অব্যাহত রাখা কঠিন হয়। এই সমস্ত অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও অনুবাদ গ্রন্থের আবশ্যক আছে। ইংরেজী এবং অন্যান্য বিদেশীয় সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অনুবাদের সাহায্যেই ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের জন্য আমি একটি অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি। আমি বলি ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ ভাষা অটুট রাখিয়া শুধু বিভিন্ন লিপিতে মুদ্রিত করা হউক। আমার বিশ্বাস এইরূপ পুস্তক বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া আন্তঃ-প্রাদেশিক মিলনের পথ প্রস্তুত করিবে। আমার প্রস্তাবের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি :

১। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার বর্ণক্রমে কোনো ভেদ নাই বলিলেই চলে, কেবল লিপির আকৃতি স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, 'অ আ ই ঈ' 'ক খ গ ঘ' রূপে যে ভাবে আমাদের বর্ণমালা সজ্জিত আছে, ভারতের সকল প্রদেশেই সেইরূপ। এমন কি দক্ষিণ-ভারতেও। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল লিপিরই উৎপত্তি। সেইজন্য বর্ণবিন্যাসে এই অভিন্নতা। (উর্দু হরফের কথা স্বতন্ত্র। তাহার সহিত ভারতীয় অন্য কোনো লিপির মিল নাই।) এই অভিন্নতার ফলে এক ভাষাভাষী পাঠক অন্য ভাষার বই কেবলমাত্র লিপ্যন্তর করিলেই পড়িতে পারিবেন। এই কথা শুধু অক্ষর সম্বন্ধে নয়, ১ ২ ৩ ৪ প্রভৃতি অংক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

২। ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের—অর্থাৎ তামিল, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ী এবং কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি আর কয়েকটি অনার্য ভাষা ব্যতীত, আর সকল ভাষার উৎপত্তি সেই বৈদিক সংস্কৃত হইতে। সব আর্য-ভাষারই ইতিহাস একরূপ। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অবস্থা অতিক্রম করিয়া সকলেই বর্তমানরূপে আসিয়া পেঁাছিয়াছে। সুতরাং আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে অনেক মিল আছে। শব্দাবলীতে এই মিল অত্যন্ত অধিক। এক ভাষা অন্য ভাষীর কাছে যতটা দুর্বোধ্য বলিয়া আমরা ধারণা করি, কার্যত তাহা সত্য নয়। অপরিচিত লিপিই আমাদের ভয়ের

কারণ হয়। বাঙলা হরফে হিন্দী বই প্রকাশিত হইলে তাহা বাঙালীর পক্ষে পড়া কঠিন হইবে না। ভারতের অনেকখানি জুড়িয়া নাগরী লিপির প্রচলন। হিন্দী ছাড়াও বহু ভাষার পুস্তক নাগরীতে মুদ্রিত হয়। সুতরাং বাঙলা ভাষার বই নাগরী লিপিতে প্রকাশিত হইলে ভারতের বহু প্রদেশের সহিত আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ সাধিত হইবে। ভারতীয় সকল ভাষা এবং লিপি সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। তবে প্রথমে প্রধান প্রধান ভাষা এবং লিপি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করাই ভাল।

৩। আমার সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার নিজের এবং অন্যপ্রদেশীয় কয়েকজন বন্ধুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ যে ভাষার সহিত পরিচয় অল্প, নিজের হরফে লিখিত সেই ভাষার রচনা পড়িয়া দেখিলেই আমার কথার তাৎপর্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বাঙলা হরফে এ ধরনের কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত বাঙলা হরফে মুদ্রিত ওড়িয়া পুস্তকসমূহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাগরী লিপিতে মুদ্রিত একটি কবিতা-সংকলন গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লোক-সংগীত, কবিতা এবং ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। উহার ভূমিকা, গ্রন্থ-পরিচয়, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি হিন্দীতে লিখিত। কিন্তু কবিতাসমূহ যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে সেইভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র পরিবর্তন করা হয় নাই, কেবল নাগরী লিপিতে ছাপানো হইয়াছে এই মাত্র।

লিপির প্রসঙ্গে স্বভাবতই রোমান লিপির কথা উঠিতে পারে; সেই-জন্য এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা আগেই বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। এক রোমান লিপির দ্বারা ভারতের সকল ভাষা লেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে সুবিধা অনেক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা গিয়াছে দেশ তাহা গ্রহণ করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। লিপি ভাষার বাহ্য চিহ্নমাত্র। এক চিহ্নের কাজ অন্য চিহ্নের দ্বারা যদি সহজে চলে, তবে চিহ্ন পরিবর্তনে আপত্তি করিবার কোনো কারণ নাই। যুক্তির দ্বারা তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু যুক্তির দ্বারা তাহা বুঝাইতে পারি না। কারণ, যুক্তি যতই শাণিত হউক না কেন, সংস্কারের গায়ে সে সহসা

দাগ বসাইতে পারে না। ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। সুতরাং ভারতীয় লিপি দিয়াই কার্যারম্ভ হউক।

আমরা যদি একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলে অভীষ্ট ফললাভে বিলম্ব হইবে না। আমি কল্পনা-নয়নে সেই শুভদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি, যেদিন বিবিধ ভাষার বিচিত্র লিপির শতদলপদ্মে অধ্যাসীনা হইয়া ভারতের সমগ্রা-রূপিণী সরস্বতী ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়োচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন :

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।"

দিল্লীর অভিভাষণ

[প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—১৩৫৫]

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বঙ্গ-সাহিত্যের বিশাল বনস্পতির ছায়াতলে আমরা বৎসরে একবার করিয়া বাঙলার বাহিরে সম্মিলিত হই। এই সম্মেলন ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত বঙ্গ-সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যামোদীদের পারস্পরিক মিলনের এক সার্থক উপলক্ষ।

এবারকার সম্মেলনের অধিবেশন-স্থান ভারতের রাজধানী দিল্লী; অতীত ইতিহাসের সুদূর অস্পষ্ট দিনেও দিল্লীর উপকণ্ঠে আর্যরাষ্ট্র-শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, পাঠান-মোগল-ইংরাজ-রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু দিল্লীর মহিমাসূর্য অস্তমিত হয় নাই। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, "Soft! thy tread is on an empire's dust." দিল্লী কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনই না দেখিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে।"

ইতিহাসবিধাতার প্রিয় লীলাভূমি এই নগরীতে যেখানে বিংশ শতাব্দীর বাঙালী বীর ও ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে,—লালকেল্লায় ভারতীয় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়াছে,—সেই দিল্লীতে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

এই সম্মেলনের পরিধি সংকীর্ণ নহে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-বিভাগের নীতি বহুক্ষেত্রে স্বীকৃত হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে নীতি

অচল; প্রাদেশিক বিভাগের দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্র বিভক্ত বা সীমাবদ্ধ হয় না বা করা যায় না। সকল সভ্যদেশেই ইহা স্বীকৃত। সাহিত্যের মানচিত্রে প্রান্ত-প্রত্যন্তের সীমারেখা অবলুপ্ত। আজিকার সাহিত্য সম্মেলনে তাই ভারতের সকল প্রদেশবাসীকেই আমরা সাদরে আহ্বান করি।

প্রতিবৎসর আপনারা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া এই সম্মেলনে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান করেন। দীর্ঘকাল এই বাৎসরিক সম্মেলন ভারতে বাঙালী সমাজের বিস্তার এবং ঐক্যের পরিচয় দিয়াছে। নিজ প্রদেশের বাহিরে গিয়াও বাঙালী বঙ্গ-দেশকে ভোলে নাই, বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দানে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙলার সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর সহধর্মিতা স্বাভাবিক এবং দীর্ঘকাল ধরিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে। অদৃষ্টের নানা ঘাতপ্রতিঘাতেও ইহা লুপ্ত হয় নাই।

পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই দিল্লী-নগরীতেই প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের একবিংশতিতম অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। বাঙলা সেদিন মন্বন্তরে মুমূর্ষু; লোভীর নিষ্ঠুর লোভ ও বণিতের নিত্য-চিত্তক্ষোভে সমগ্র দেশ আলোড়িত। আজ ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু আজও বাঙালীর দুর্দিনের অবসান হয় নাই। আজ বাঙলা খণ্ডিত হইয়াছে। তাহার বৃহৎ এক অংশ ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অগণিত বাস্তুহীন বাঙালীর যেন আজ ধরণীর কোলে কোথাও স্থান নাই। দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিপীড়ন শেষ হইতে না হইতে বাঙালী আবার গৃহহীন সর্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ ছয় কোটি বাঙালীর অধিকাংশ প্রবাসী, কেবল প্রবাসী নহে তাহারও অধিক,—রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন।

যে সমস্ত বাঙালী বাঙলার বাহিরে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে যে অগণিত বাঙালী ভারতীয় রাষ্ট্রের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সমস্যার কি প্রতিকার হইবে? তাঁহাদিগকে লইয়া বাঙালী সমাজের যে সমগ্রতা তাহা রক্ষা করার কি কি ব্যবস্থা হইবে? ইহা আমাদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড

সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করিতে সাহিত্য-সাধকগণকে আমি অনুরোধ জানাইতেছি; রাজনীতি ও রাষ্ট্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ছেদ ঘটাইয়াছে তাহার উপর দিয়া মিলনের সেতু রচনা করিতে সাহিত্যিকগণকে আমি আহ্বান করিতেছি।

বাঙালী বলিয়া আমরা যদি গৌরব বোধ করি, আশা করি কেহ তাহাকে স্পর্ধা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। আমাদের জীবনেও দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, অপমান-অত্যাচার আছে এবং হয়তো কিছু বেশী পরিমাণেই আছে। তাহার জন্য আক্ষেপ করিব না; দুই শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের দেহমনকে যতটা পীড়িত করিয়াছে আর কাহাকেও ততটা আঘাত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। আজ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়াছে; সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ক্ষতচিহ্ন এখনও মুছিয়া যায় নাই। কখনও যদি নাই মুছে, তাহাতেই বা দুঃখ কি? ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, প্রদেশগত সুবিধার জন্য নহে, সমগ্র দেশের ও সমগ্র জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া যাহারা বুক পাতিয়া আঘাত সহ্য করে তাহাদের ত্যাগ ব্যর্থ হয় না।

কিছুকাল যাবৎ ভারতের স্থানে স্থানে সংকীর্ণ প্রাদেশিক বুদ্ধির অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এখন হইতেই এই ভাব দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতাও ভারতের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বিহার বিহারীর জন্য, আসাম অসমীয়াদের জন্য, বাঙলা দেশ বাঙালীর জন্য এই প্রকার ভাবধারা জাতীয়তা এবং ঐক্যের পরিপন্থী। এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দূর করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মত প্রবাসীদেরও তত্তৎপ্রদেশের প্রতি কর্তব্য আছে। একথা প্রত্যেক প্রদেশের প্রবাসীদের পক্ষে প্রযোজ্য। ইংরেজেরা যেভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া দূরবীণ দিয়া দূর হইতে এ দেশবাসীকে দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন না করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যাইতেন, ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে বাস করিবার সময়ে যেন সেই মনোবৃত্তি অবলম্বন না করেন।

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশগুলির যে স্বাতন্ত্র্যই গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রত্যেকেরই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে এক সংস্কৃত ভাষা এবং এক ভারতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন ভাষা এবং

সংস্কৃতিতে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া শুধু সম্ভবপর নয়, অনায়াস-সাধ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপি এ-ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি করে তাহা দূর করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নহে। আজ যদি সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই স্বীয় লিপির সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরী লিপিও গ্রহণ করে, অর্থাৎ যদি দেবনাগরী লিপিতেও প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মুদ্রণ হয়, তবে তাহাতে শুধু যে প্রদেশগুলির পক্ষে পরস্পরের সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করার পথ সুগম হইবে তাহা নয়, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলি একটা স্বাভাবিক সমন্বয় এবং সর্বভারতীয় ঐক্যের পথে চলিবে। শুধু অনুবাদের ভিতর দিয়া কেবল বিভিন্ন সাহিত্যের মূল রস পূর্ণভাবে আস্বাদ করা যায় না। সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্য একটি সর্বভারতীয় লিপি আবশ্যক —এক্ষেত্রে দেবনাগরীই হইবে সেই লিপি। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, লিপি ভাষা নহে, ভাষার চিহ্নমাত্র। সমগ্র ইউরোপে একই রোম্যান লিপি প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা ও দ্বন্দ্বের লাঘব হয় নাই। তাহা হইলেও যেখানে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মূল উৎসও অভিন্ন, সেখানে সর্বভারতীয় লিপির প্রচলনের দ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি বর্ধিত হইবে, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে এবং সর্বভারতীয় ঐক্য একটা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য আজ যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা যেমন বাঙালীর গৌরব, তেমনই ভারতের গৌরব; সাহিত্যের দিক দিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালীই যে ভারতের স্থান করিয়া দিয়াছে একথা ভারতবর্ষ উপলব্ধি করে এবং আনন্দের সহিত স্বীকার করে। বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যে আজ ভারতের সর্বসাধারণের অধিকার। সে অধিকার যাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে (বাঙলা ভাষাতেই) প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু 'সঞ্চয়িতা' নহে, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাঙলা রচনারও এইরূপ দেবনাগরী সংস্করণ আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী সাহিত্যিকদিগের পরিচয় এ-পর্যন্ত অনুবাদের

সাহায্যেই অবাঙালী পাঠক-পাঠিকারা লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের গ্রন্থাবলীরও দেবনাগরী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ভারতের বিভিন্ন অংশের সাংস্কৃতিক মিলন সাধনের পক্ষে প্রস্তাবিত এই উপায়কে আপনাদের বিবেচনার জন্য এই সভাসমক্ষে উপস্থিত করিলাম। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উপায় বিশেষ চিন্তনীয়। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন পৃথকভাগে আপন আপন সমস্যা আলোচনা করে ও করিবে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া সর্বভারতীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিভাবে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাদের প্রসার ও প্রচার ঘটিতে পারে, কিভাবে সাহিত্যসাধনার ভিতর দিয়া প্রাদেশিকতার ভাব দূর হয়, ভারতের জাতীয় ঐক্য পরিপুষ্ট হয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি শক্তিশালী হইতে পারে, ইহাই সেই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। আমি আশা করি, আমার এই প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃ-পক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

বাঙলা সাহিত্যে এক অভাবনীয় জাগরণ শুরু হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ইহার মূলে ছিল যেমন বাঙ্গালীর প্রতিভা, অবস্থাও ছিল তেমনই অনুকূল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং চিন্তা-ধারার স্রোত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে জোয়ার আনিয়াছিল। এই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সন্ধান পাইয়াছিল; তাই ভারতে নূতন যুগের বাণী সর্বপ্রথম বাঙালীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই প্রমাণ হয় জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নতা এবং সংকীর্ণতাই মৃত্যু। সমস্ত পৃথিবীতে জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপনেই জীবন এবং অগ্রগতি। পিছনে থাকিয়া স্বদেশের সংস্কৃতিতে বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলে আমরা শুধু অচলায়তনই গড়িয়া তুলিব। তাই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি অব্যাহত রাখিতে হইলে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বিদেশের ভাবধারায়ও অবগাহন করিতে হইবে। এই জন্যই বাঙালীকে এখন পূর্বাপেক্ষাও অধিকভাবে ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি

বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচয় রাখিতে হইবে। এতকাল ভারতীয়দের ইংরেজী শিখিতে হইয়াছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল বলিয়া, কিন্তু বাঙালী ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য আত্মস্থ করিয়াছে তাহার সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যের জন্য। শুধু চাকরির প্রয়োজনে যে শিক্ষার দরকার ছিল বাঙালী তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়াছে এবং সে শিক্ষাকে আনন্দে পরিণত করিয়াছে। আজ চাকরির প্রয়োজনে ইংরেজীর মূল্য কমিলেও বাঙালী-প্রতিভার নিকট বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য এবং প্রয়োজন কমিতে পারে না। পশ্চিমে যে দ্বার একদিন খুলিয়া গিয়াছিল, সে দ্বার যদি আরও প্রসারিত করিতে না পারি, তবে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়? যে সমস্ত মহাপুরুষ বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালী সমাজের উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই একদিন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালী জীবনের বিপুল বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ বাঙালী সমাজের সর্বাধিক গৌরবের সামগ্রী বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য। আমাদের যে দেশপ্রীতির বন্যা একদিন সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল সে দেশপ্রীতি শুধু কর্মেই নিঃশেষিত হয় নাই; সেদিন বাঙলার চিত্তের উন্মাদনা সাহিত্যরূপেও প্রকাশ পাইয়াছে, আবার সাহিত্যই তাহাকে জন্ম দিয়াছে, পুষ্ট করিয়াছে। বাঙালী ভারতবর্ষে অর্থসম্পদে প্রাধান্য পায় নাই। কিন্তু চিত্তের সম্পদে যেমন নিজেকে পরিপুষ্ট করিয়াছে তেমনই দেশমাতৃকার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' সন্তান-ধর্মের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগীত বাঙালী-চিত্তে দেশপ্রীতির উৎস খুলিয়া দিয়াছে। বাঙালী গাহিয়াছে—

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।"

বাঙালীর রাজনীতি যে শুধু শুষ্ক তর্কনির্ভর নয়, তাহার প্রমাণ মিলিল যখন অসহযোগ আন্দোলন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত কবিকেও গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাজনীতির কঠোর জীবনের মধ্যে, স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মাহুতির মধ্যে তিনি "সাগর সংগীত" শুনিতে পাইলেন। সাহিত্য-সেবা দেশ-সেবায় পর্যবসিত হইয়া তাঁহার জীবন একটি সার্থক সুন্দর সুমহৎ কবিতায় পরিণতি লাভ করিল।

শুধু দেশপ্রীতিই যে বাঙলা কাব্যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, বাঙলা কাব্যের সরস্বতী বহুসুরবিশিষ্টা। কাব্য এবং কথা-সাহিত্যে বাঙালীর কীর্তি লইয়া আমরা যথার্থই গর্ব অনুভব করিতে পারি। কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়া সেখানেই থামিয়া যাওয়া জীবনের লক্ষণ নয়। বরং আমাদের কীর্তিতে কোথাও ফাঁক রহিয়াছে কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ফাঁক পূরণ করিয়া নূতন নূতন সম্ভাবনার দিকে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। কাব্যের তুলনায় আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য দরিদ্র ইহা অস্বীকার করা চলে না। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মনীষিগণ অতীতে প্রবন্ধ-সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সত্য এবং কাব্যের মত গগনস্পর্শী না হইলেও, প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি যে বিরাট ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্যের দিক দিয়া বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বর্তমানে আশানুরূপ সমৃদ্ধ নয়। বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যের অপেক্ষা রাখে নাই। কাজেই অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকের দোষ দিয়া লাভ নাই। আমাদের স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কি উপায়ে বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত অংশ বলিষ্ঠ করা যায়। যে প্রখর বাস্তবনিষ্ঠা, গভীর মননশীলতা এবং বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎকর্ষের মূলে তাহার যথাযোগ্য অনুশীলন আজকাল দেখা যাইতেছে না। বাঙলা সাহিত্যের যাঁহারা দিক্‌পাল তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

আজ বাঙালী সমাজের সম্মুখে বিভিন্ন এবং বিচিত্র প্রকার কঠিন

সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে বাঙালী সমাজ সম্মানের সঙ্গে বাঁচিতে পারিবে না। হীন এবং দুর্বল হইয়া পড়িলে বাঙলাদেশ ভারতবর্ষকেও দুর্বল করিবে, কেননা অংশের শক্তিই সমগ্রের শক্তির উৎস। দুর্গতি হইতে বাঙলাদেশকে বাঁচাইবার ভার সমগ্র বাঙালী সমাজের উপর। আজ কি উপায়ে সেই মহৎ কর্তব্য পালন করা সম্ভব তাহাই আপনাদিগকে ভাবিতে বলি। এ-বিষয়ে গত শতাব্দীতে যে সমস্ত মনীষীর প্রতিভার জন্য আজ বাঙালী শ্রদ্ধেয়, তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা এক বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ আজিকার দিনে এই শিক্ষা গ্রহণেরই প্রয়োজন হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।" এই পরম সত্য কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করিবার সময় হইয়াছে। সাধনা ও নিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শ্রমশীলতা অবলম্বন না করিয়া আমরা বড় হইতে পারিব না। এই গুণসমষ্টির অভাবে জাতি বাঁচিতেই পারে না, বড় হওয়া দূরের কথা। কিছুকাল পূর্বেও শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া বাঙালী ভারতে নেতৃত্বের অধিকার পাইয়াছিল। ইহার পিছনে ছিল বাঙালীর বিরাট সাধনা। আজিকার দুর্দিন অতিক্রম করিতে হইলে আমাদের পূর্ববর্তীগণ যে সাধনার বলে বড় হইয়াছিলেন তাহারই অনুশীলন করা কর্তব্য। আজ আমরা যে সংকটের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি বাঙালী-সমাজের ইতিহাসে এমন সংকট ইতিপূর্বে আসে নাই। প্রথম হইতে বাঙালী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ত্যাগস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত বাঙলাকে খণ্ডিত হইতে হইয়াছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হইতে বাঙালী সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক ভবিষ্যৎকে বাঁচাইতে হইলে বাঙালীকে আবার পুরুষসিংহের মত দাঁড়াইতে হইবে। শুধু পূর্বগৌরবের কথা প্রচারের দ্বারা শ্লাঘা বোধ করিলে চলিবে না, অথবা বর্তমান দুর্দশার কথা বারবার ঘোষণা করিয়াও মুক্তি আসিবে না। কঠিন হস্তে সকল মলিনতা ও দুর্বলতাকে দূর করিতে হইবে এবং স্বীয় চরিত্রশক্তি সম্বল করিয়া কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে;

তবেই সমাজ রক্ষা পাইবে, পুনরুত্থান সম্ভব হইবে। সাহিত্যের দিক দিয়া এক্ষেত্রে যাহা কর্তব্য, বর্তমান সম্মেলনে আপনারা তাহা বিবেচনা করিবেন। ৭৭ বৎসর পূর্বে জাতিগঠনের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন সাহিত্য শুধু জীবন প্রতিফলিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্য জাতির পথপ্রদর্শনও করিয়া থাকে। সাহিত্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে যেমন রূপায়িত করে, তেমনই তাহাকে গতিও দেয়। ভাষা এবং সাহিত্যের পথ দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কি অসামান্য কীর্তির প্রতিষ্ঠাই তিনি করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা তাঁহার পরবর্তীরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহার তিরোধানের পর প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-সমাজের পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা একদিন জাতিগঠনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে, আজ চরম দুর্দিনে সমাজকে রক্ষা করিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণে পুনরায় বল সঞ্চার করুক, ইহাই প্রার্থনা।

বন্দে মাতরম্

কটকের অভিভাষণ

[নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—১৩৫৯]

অদ্যকার সভায় যে সম্মানের আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে আপনারা আহ্বান করিয়াছেন, তাহা যে আমি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। আমি নিজে সাহিত্যিক নহি, তবে জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিতে, বলশালী করিতে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা যে কি তাহা আমি বুঝি। সেই কারণে সুধীজনের অনুরাগপূর্ণ আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। এই সম্মেলনের কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।

উড়িষ্যার রজধানী কটক নগরীতে এই সম্মেলন আহ্বান করিয়া আপনারা সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন। এই প্রদেশের সহিত বাঙলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ধর্ম, কর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই প্রদেশের মধ্যে অনেকখানি ঐক্য রহিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় বাংলার সহিত উড়িষ্যাও প্লাবিত হইয়াছিল। সেই ভাবধারা আজও সুস্পষ্টভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের পদরেণুস্পর্শে এখানকার ধূলিকণা পর্যন্ত পবিত্র হইয়াছে। ভেদাভেদ ও জাতিবিচারশূন্য মহাতীর্থ শ্রীক্ষেত্র ভারতের মিলনক্ষেত্র হইয়াছে। জীবাত্মার ও পরমাত্মার মহামিলন-মন্ত্রে এ দেশ পুণ্যভূমি হইয়াছে। উড়িষ্যার নিজস্ব একটি ঐতিহ্য আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহার দান কম নহে। কোনারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের শিল্পচাতুর্য প্রভৃতির তুলনা নাই। শিল্প ও স্থাপত্য-জগতে ইহারা বিস্ময়ের বস্তু। এই কটক নগরী বাঙলার তথা সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তান সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান। পাঠান ও মোগল শক্তির আক্রমণ হইতে রাজনৈতিক

স্বাধীনতা উড়িষ্যা বহুদিন রক্ষা করিয়াছিল। শৌর্য বীর্যের ক্ষেত্রে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। এই সকল কারণে আজ আমরা এইস্থানে সম্মিলিত হইয়া গৌরব অনুভব করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যখন জন্ম হয়, সে সময়টিকে আমাদের মধ্যে অনেকেই বাঙলার একটা দুঃসময় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমার মনে হয় আজিকার তুলনায় তাহাকে সুসময় বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। বঙ্গদেশ তখন বিদেশী শাসকদের কূটনৈতিক চালে দ্বিখণ্ডিত হইলেও সে সময়ে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন উপলক্ষে বরিশালের নিমন্ত্রণপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "সভার উদ্দেশ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন"। আজ এইরূপ আমন্ত্রণপত্র ঢাকা বা বরিশাল হইতে আসিবার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ শাসক জোর করিয়া যে বাঙলাকে সে দিন ভাঙিয়া খণ্ডিত করিয়াছিলেন, বাঙালী আপন শক্তিতেই সেই খণ্ডিত বাঙলাকে আবার জোড়া লাগাইয়াছিল। আজ আবার যখন নিয়তির পরিহাসে সেই জোড়া বাঙলা ভাঙিয়াছে, তাহা কি পুনরায় বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত শক্তিতে জোড়া লাগিবে? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন—"যে রাজ্য পরজাতি পীড়ন শূন্য, তাহা স্বাধীন" ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙলার যে বৃহৎ অংশকে বলি দিতে হইয়াছে, সেই অংশের বাঙালী অধিবাসীরা পর-জাতির পীড়নের তীব্র জ্বালা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। আর স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রাংশ পশ্চিম বাঙলার মধ্যে যাহারা আছে, তাহারাও আজ নিরাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছে—"যে রাজ্য স্বজাতি-সহানুভূতি-শূন্য, তাহা কি স্বাধীন? যে রাজ্য তোষণনীতির নিমিত্ত স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন, সে রাজ্যকে কি স্বাধীন বলিব? বাঙালীর জীবন আজ মহা বিপন্ন। এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে বাঙালী জাতিকে আর কখনও পড়িতে হয় নাই। এই বিপর্যয়ের হাত হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিতে হইবে। বাঙালীর অস্তিত্ব যাহাতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, তাহার জন্য কর্তব্য-পথ নির্ণয় করিতে হইবে; সেই কারণেই আমি বলিতে চাই—কেবলমাত্র মাতৃভাষার উন্নতিসাধন ও

সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন এই সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই সাহিত্য-সভা কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যসেবীদের সভা নহে। নিজেরা লেখক না হইয়াও যাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয়-সমস্যা সমাধানের জন্য, জনগণের আশা, আকাঙক্ষা, ভাবকে রূপায়িত দেখিতে চান, তাঁহারাও এখানে উপস্থিত আছেন। সকলে মিলিয়া বাঙালী জাতির জটিলতাপূর্ণ সমস্যাকে আজ স্বাধীন ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীদের অন্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্য ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগী অনেকেই এখানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারাও উপলব্ধি করিবেন—ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই ঐক্য-নীতিকে ভিত্তি করিয়া যাহাতে সর্ব প্রদেশের ভাষার ও ভাবের সংগঠনকার্য নির্বাহ হয়, তাহার উপায় নির্ধারণ করা এই সম্মেলনের এক প্রধান কর্তব্য হইবে। এই প্রকার বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সংযোগে ভারতের বিরাট সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষিত ও পরিবর্ধিত হইবে।

ভাষা হইতেছে ভাব ও সংস্কৃতির বাহন। এই বাহন যে দেশের যত শক্তিশালী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই দেশ তত বীর্য ও ঐশ্বর্যশালী। দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী ভাষাই একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে পারে। ভাষার মুকুরে আমরা অতীতকে প্রতিবিম্বিত দেখি, বর্তমানকে কর্মমুখর করিয়া তুলি এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়া উন্নত মস্তকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই। সেই লক্ষ্যপথে ভাষা ও সাহিত্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে সভ্যতার পরিব্রাজকদের পরিচালিত করে। ইহা শাশ্বত অভ্রান্ত সত্য। ভারতবর্ষে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহুতর ভাষা প্রচলিত। প্রধান প্রধান সকল ভাষার মধ্যেই অল্পবিস্তর কিছু না কিছু ভাব-সুষমা সঞ্চিত আছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা, বিশিষ্ট সাহিত্যগৌরব ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেড়শত বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-সাধকদের তপস্যায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদেরই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সাধনা ও তপস্যার প্রভাবে সারা ভারতে এক অভিনব জাগরণ হইয়াছিল। বাঙলায় যে নূতন ভাববন্যা ও কর্মধারার প্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা বাঙালী নিজের

ঘরেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই—নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টির বাণী সে ভারতের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালী সমগ্র দেশের সুপ্ত মনকে জাগাইয়া তুলিয়া স্বাধীনতার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীকে অস্থির ও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ ও উন্নতিবিধানের জন্য বাঙলার সাহিত্যরথীরাই প্রথম পথের ইঙ্গিত দেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু খ্যাত ও অখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক যাত্রাগান, কথকতা, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধাদির ভিতর দিয়া সমগ্র বাঙালী-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাণীর বরপুত্রেরা কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও কাহিনীর মধ্য দিয়া স্বদেশের চিত্তভূমিকে তীব্র দেশাত্মবোধের অমৃতধারায় যেমন অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে অক্ষয়, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিগণ দেশের চিন্তাক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। কাব্য, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি রসসমন্বিত সাহিত্য সৃষ্টির পার্শ্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সব কিছুই বঙ্গভারতীর অঙ্গন ও প্রাঙ্গণকে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃতানুগ বাঙলা ভাষা পণ্ডিতমণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত। কিন্তু সব্যসাচী বঙ্কিম সেই যে তাহাকে একটি সার্বজনীন রূপ দিয়া সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, তদবধি বাঙলাভাষা অজস্র প্রাণধারায় প্রবাহিত হইয়া সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্পত্তিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পর সেই ভাষাকে জনসাধারণের নিকটে লইয়া আসিলেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর পুণ্যস্পর্শে এই রচনাপদ্ধতি আরো সরলতা ও বিকাশলাভ করিয়া সাহিত্যে স্থায়ীরূপ পাইয়াছে। নব নব বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে কবি ও সাহিত্যরথীদের দাক্ষিণ্যে, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবিদ্, প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের অকৃপণ দানের সম্ভার লইয়া বাঙলা-সাহিত্য যে কত শীঘ্র গতিবেগ লাভ করিয়াছে, তাহার কাহিনী ও ইতিহাস আপনাদের অবিদিত নাই। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বাঙলার এই গতিশীলতার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙলার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙলার সভ্যতা, কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধর্ম, সকল ক্ষেত্রেই একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নিজস্বতা চিরকালই আছে। সাধারণতঃ সংকীর্ণতা বা স্বার্থপরতাকে বাঙলাদেশ আমল দেয় নাই। এক সমন্বয় পদ্ধতিতে সে আপনার এই বৈশিষ্ট্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভাব, কৃষ্টি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও এই সমন্বয় পদ্ধতি বাঙলার সাহিত্যকে সেই কারণে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ পরিধির ঊর্ধ্বে উঠিতে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজ যখন বণিকের মানদণ্ড হাতে লইয়া আসিয়া এদেশে রাজদণ্ড অধিকার করিয়া বসিল, তখন সর্বপ্রথম বাংলার সহিত ইংরাজী সভ্যতা, ভাবধারা ও চিন্তাজগতের সংঘাত ঘটিয়া গেল। চারিদিকে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বাঙালীর মননশীলতাকে যেমন উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল তেমনি দেশাত্মবোধের অভিমন্ত্রও তাহার বুকে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। কিন্তু, বাঙালী আপন ঘরেই এই নূতন আলোকের দ্যুতিকে ধরিয়া রাখে নাই। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রদেশে প্রদেশে তাহার দিব্যচ্ছটা পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার সুযোগ সে গ্রহণ করিয়াছিল। সংকীর্ণ মনোভাব বাঙালীর কোনদিন ছিল না, পরকে সে আপন করিয়াছে, দূরকে নিকট করিয়াছে এবং বাহিরকে ঘর করিয়াছে। তাহার সাহিত্যে বৃহত্তর ভারতের রূপ সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব গীতি-কবিতার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাহা কিছু ভাষা অলংকার ও ছন্দে বাঙালী গাঁথিয়া তুলিয়াছে, তাহার সব কিছুই সে বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প আজ কোথাও কোথাও ধূমায়িত হইতে দেখা যাইতেছে, বিরাটের পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বভারতীয় মনুষ্যত্ববোধের উদারতার দ্বারা এই আত্মধ্বংসী বিষের বিনাশ সাধন আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যের ভার সর্বভারতীয় কবি ও সাহিত্যিকদেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষাসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির বহুধা রূপ ছড়াইয়া আছে। ভারতের কবি, সাধক ও ভাবুকদের অন্তরের অপূর্ব ভাবরাজি সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নানাভাবে

অজস্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবীর, দাদু, নানক, সুরদাস, মীরা ও তুলসীদাস প্রভৃতির অমর রচনাবলীর মধ্যে কতই না মহামূল্য সম্পদ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও আধ্যাত্মিক ও চিন্তার রাজ্যে যে এই বিরাট দেশের মনীষীরা এক অখণ্ড একাত্মতার সুর জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

ভারতের প্রধান লক্ষ্য বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনা। সাহিত্যের মাধ্যমে এই লক্ষ্যের ফল্গু প্রবাহ চিরদিন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাই যাহাতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিক সাহিত্য-গুলি পঠন-পাঠনের দ্বারা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। তাই আজ প্রয়োজন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি সর্মাধিক ঐশ্বর্যশালী তাহারা যাহাতে আপন আপন ক্ষেত্রে উন্নত হইয়া উঠে, গৌরবময় হইয়া উঠে, নব নব ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া। এক ভাষাকে দাবাইয়া রাখিয়া অন্য ভাষার প্রসার ও প্রভাব বিস্তৃতির চেষ্টা উচিত নহে, সমর্থনযোগ্যও নয়। ভাষা লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাঁধিয়া উঠে, তাহার অপেক্ষা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর কিছুই থাকিতে পারে না।

স্বাধীনদেশের একটা রাষ্ট্রভাষা থাকা প্রয়োজন। ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পর রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই হিন্দীভাষা প্রচলিত এবং জনসাধারণের মধ্যেও হিন্দীভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। অনেকের ধারণা, হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা কংগ্রেসমহল হইতেই প্রথম উঠিয়াছিল। কিন্তু, সে ধারণা ঠিক নহে। অনেকেই হয়ত জানেন না, বাঙ্গালীর সাহিত্যগুরু বঙ্কিম-চন্দ্রই বহুকাল পূর্বে, বোধহয় সর্বপ্রথম, বলিয়াছিলেন—"হিন্দীভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাঁহারা ঐক্যবন্ধন স্থাপন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।" বঙ্কিমের এই উক্তির সদৃশ অভিমত বঙ্কিমের অন্যতম

সাহিত্য-সহচর অক্ষয়চন্দ্রের "সাধারণী" পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। রক্ষণশীল নৈষ্ঠিক বাঙালী ব্রাহ্মণ-মনীষী ভূদেবচন্দ্রও হিন্দীভাষার পক্ষে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রাদেশিকতা-বর্জিত শুভ বিচারবুদ্ধি বাঙালীর তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তবে, অন্য কোন ভাষার ঊর্ধ্বে মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়ার নাম যদি প্রাদেশিকতা হয়, তাহা হইলে অকুণ্ঠচিত্তে বলিব, সে প্রাদেশিকতা আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহা না থাকিলে আমরা সর্বহারা হইয়া যাইব। মনে রাখিতে হইবে, যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দীভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য-বন্ধনের কথা বলিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' সূচনায় লিখিয়াছিলেন—"যতদিন না সুশিক্ষিত, জ্ঞানবন্ত বাঙালীরা বাঙলাভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" ভারতের সকল প্রদেশের ভাষাভাষীই নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে একথা বলিতে পারেন। সর্ব জাতির পক্ষে সকল সময়েই ইহা সত্য।

কোন প্রদেশ যদি অপর প্রদেশের লোক যাহারা সেখানে কার্যব্যাপদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মাতৃভাষা শিখিতে না দিয়া নানা উপায়ে অপর ভাষায় লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা বা চেষ্টা করে, তবে তাহাকে নিন্দা না করিয়া উপায় নাই। যদি কোন প্রদেশ এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাকে কুব্যবস্থাই বলিব। কারণ, তাহার ফল কিছুতেই কল্যাণজনক হইতে পারে না। তাহাতে অন্য ভাষাভাষীর জাতিগত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবেই। কোন জাতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিয়া তাহাকে উন্নত করিতে পারা যায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। রবীন্দ্রনাথও একদিন বলিয়াছিলেন—"ভালই বল, আর মন্দই বল, প্রকৃতি ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্তই খাপছাড়া হইয়া যায়।" এই মারাত্মক মনোবৃত্তির নামই প্রাদেশিকতা। এই মনোবৃত্তি মিলনের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া জাতি-পরস্পরের মধ্যে কেবল বিরোধ ও বিদ্বেষের ভাবকেই জাগাইয়া তোলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছিলেন—"জীবন-ধর্মের নিয়মে যেখানে বৈচিত্র্য খুব বেশী,

সেখানে ঐক্যও তেমনি গভীর ও সুদৃঢ় হইতে পারে—এই ঐক্যই তো জাতীয়তা।" কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সত্যবাণীর মর্ম স্বাধীনতা লাভের পর আমরা অনেকেই আজ বুঝিতে চাহিতেছি না।

হিন্দীভাষা যদি সহজ সরল হইয়া উঠিয়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের সাধারণ বাহনরূপে গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে নির্দেশ আসিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে কাহারো আপত্তি থাকা সমীচীন নহে। এই ভাষাকে প্রকৃত ভারতীয় রূপ দিতে হইলে ও সকলের কাছে বোধগম্য করিতে হইলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহৃত উপযুক্ত শব্দাবলী স্বাভাবিক ভাবে হিন্দীর অন্তর্গত করিতে হইবে। ইহার ব্যাকরণও সরল করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে বিশ্বের সহিত যোগসূত্র রক্ষার জন্য এবং আমাদের শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরাজী ভাষা আমাদের ত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। ইংরাজ এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ভাষাকেও এই দেশ ছাড়া করিতে হইবে, এমন কথা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বলিবেন না। বাঙলার যে সময়কার সাহিত্য-সম্পদ দেখাইয়া আমরা গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহার সৃষ্টি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত বাঙালীর পরিচয় না ঘটিলে সম্ভবপর হইত না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে নিজের প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা ছাড়াও ভারতের একাধিক প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অন্ততঃ যে সকল প্রাদেশিক ভাষার ঐতিহ্য আছে, বিস্তৃতি আছে, ঐশ্বর্য এবং রস-মাধুর্য আছে, সেই ভাষাগুলি লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই আদর্শ অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের রীতি প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় প্রত্যেক প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে শুভ ফলই পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু অন্যান্য প্রদেশের লোক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহারা যদি মাতৃভাষার চর্চা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং সভা-সমিতি ও সম্মেলনের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, প্রভৃতি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃ-

ভাষার প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পাইবে। আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ও ভাব বিনিময় এই পথে অতি সহজেই হইতে পারে। ভারতের যে ভাষাগুলি সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী, সেগুলির উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলিকে অন্য প্রদেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহার ফলে আমাদের চিত্তক্ষেত্র রসসমন্বিত হইয়া উঠিবে এবং এক প্রদেশের অধিবাসীর সহিত অন্য প্রদেশের অধিবাসীর অন্তরের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একাত্মতার ভাব জাগরিত হইবে। অনুবাদ সাহিত্যের যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, তাহা বাঙলার গৌড়ীয়যুগ এবং ইংরাজ শাসনের প্রথমযুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং আজ স্বাধীন-ভারতে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে সমুন্নত, গতিশীল ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যে মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনুবাদ কার্যেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার মধ্য দিয়া একটা মানসিক উদারতার ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে—দৃষ্টিভঙ্গির সাম্য ও ঐক্যভাব সৃষ্টি হইবে। কেবল ভারতীয় সাহিত্যগুলির অনুবাদ করিয়াই তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না, বিশ্বসাহিত্যে যেখানে মূল্যবান যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মগত করিয়া লইতে হইবে।

বাঙলা দেশের কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি বাঙলা ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রকে জড়াইয়া লইয়া যদি সাহিত্যের মাধ্যমে নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারেন, বর্তমানের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারেন, তাহা হইলে কোন আঘাতই তাহাকে খর্ব করিতে পারিবে না। আপন প্রাণ-প্রাচুর্যে, অন্তরের শক্তির বেগে সে ভাষা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বমহিমায় সুদৃঢ় গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

বাঙলাদেশ আজ খণ্ডিত। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার ভাষা আজও এক। একই ভাষায় হিন্দু-মুসলমান মনের ভাব প্রকাশ করে, চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আজ আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভাষারক্ষেত্রে আজও আমাদের মধ্যে

অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। বাঙলা ভাষা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। বহু মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক বাঙলা ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। রাজনৈতিক ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ব বাঙলা পশ্চিম বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা তাহাদের প্রাণের ভাষা এই বাঙলা ভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহার অমর্যাদা হইতে দিতে তাহারা নারাজ। ভাষা লইয়া আন্দোলন সেখানে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। তাহাদের মাতৃভাষা বাঙলা ভাষাকে ফেলিয়া উর্দু শিক্ষা করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত নয়। জোর করিয়া উর্দুভাষাকে প্রচলিত করিবার অপচেষ্টা সেখানে আজ পদে পদে বাধা পাইতেছে। বাঙলার সহিত উর্দুশব্দ মিশাইয়া এক কৃত্রিম ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টাও চলিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল চেষ্টা ব্যর্থই হইবে। কে জানে এই ভাষার বেদীমূলেই হয়ত কৃত্রিম ভেদরেখার অস্তিত্ব বিলোপ পাইবে, আবার নূতন করিয়া এক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সাহিত্যের উদার ছত্রতলে উভয় বঙ্গের মিলন সাধিত হইবে। শান্ত, সংযতচিত্তে আমাদের সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আজ এই সভাক্ষেত্র হইতে সমস্ত বাঙালীজাতিকে—যে যেখানেই থাকুন না কেন—আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা জ্ঞাপন করি।

অনেকই বলিতেছেন—বাঙালী আজ পিছাইয়া পড়িতেছে। বাঙালীর সেই তেজ ও সজীবতা নাই, সেই উদ্যম ও উৎসাহ নাই। এই অভিযোগ যে অসত্য, এমন কথা অবশ্য বলিতে পারি না। ইংরাজ শাসনের আমলে শুধু বাঙালী নহে—ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। কিন্তু, সে সংস্পর্শের ফলে বাঙলায় যেমন মনীষা ও প্রতিভার দীপ্তি দেখা দিয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী ছিল তখন অগ্রণী—সকল বিষয়েই ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক। রামমোহন, রামগোপাল, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিক্‌পাল এই কথারই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ইহার পর বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, অরবিন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী

শক্তিধর বাঙালী-শিরোমণিগণ আসিয়া দেশের ধর্মে, শিক্ষায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও রাজনীতিতে যে অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাও অনতিকালপূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু, আজ আর সে দিন নাই। বাঙালীর সেই মনীষাপারম্পর্যের দ্যোতক বা স্মারক বলিতে এখন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের নাম এই মাত্র করিলাম, অনেক সময়ে মনে হয়, তাঁহারা বুঝি আমাদের কেহ নহেন। বাস্তবিকই বাঙালী আজ সর্ব কার্যে প্রভাহীন, হৃতসর্বস্ব হইতে বসিয়াছে। কিন্তু, কেন এমন হইল, তাহাই ত' ভাবিবার বিষয়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, যে জাতি দুঃখ-দারিদ্র্যের দাবানলে আজ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, সে জাতির আত্মোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? এই উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, তাহা আমি বলি না। দুঃখের ভীষণ আঘাতে সকল মানুষই প্রথম বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে। বাঙালীরও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু, সেইজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। বাঙালী কোন দিন তাহা হয় নাই। যে বাঙালী একদিন মাৎস্যন্যায় দূর করিয়া মনের মতন রাজা নির্বাচন করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর বংশধরেরা যে আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন ক্ষয় করিবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। দুঃখই শক্তির উৎস। দুঃখই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সুতরাং দুঃখ হইতে, বেদনা হইতে, আজ যদি আমরা শক্তি-সঞ্চয় না করিতে পারি,—শিক্ষালাভ না করিতে পারি, তবে তাহার অপেক্ষা বড় ক্ষোভের কথা আর কিছু থাকিবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, সে আশার বাণী, সে শিক্ষার কথা আজ আমাদিগকে কে শুনাইবে? ইহার উত্তরে বলিব, মানব-মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ মন্দির যে সাহিত্য তাহারই পুরোহিতবর্গ সে কার্যে ব্রতী হইবেন। সাহিত্যই জাতি-জাগরণের প্রধান সহায়। আমাদের দেশের স্বদেশীযুগের সৃষ্ট সাহিত্য এই কথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"যে লেখনী আর্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফল হউক।" সাহিত্যগুরুর এই বাণী আধুনিক সাহিত্যসেবীরা যেন বিস্মৃত না হন, ইহাই আমার প্রার্থনা। লোকরঞ্জন করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে না, মানুষকে দেবত্বে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহাদের ব্রত।

এককালে যে বাঙলাভাষা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার ত্রিস্রোতা শক্তিবেগ সম্পন্না হইয়া সারা বাঙলার চিত্তভূমিকে উর্বরা ঐশ্বর্যশালিনী ও গরবিনী করিয়া তুলিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তিরোধানে সেই বাঙলা-সাহিত্যের দিক্‌চক্রবাল কিছুটা তমসাচ্ছন্ন হইলেও, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। যে ভাষায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আছে, শক্তি, সাধ্য ও সাধনা আছে তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। নূতন সাহিত্যসাধকদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে এই ক্ষণস্থায়ী অন্ধকার অচিরেই বিদূরিত হইবে। অমিত প্রাণশক্তির সঞ্জীবনী ধারায় মরাগাঙে আবার বান ডাকিবে। সেইসব শক্তিধর সাহিত্যসাধকদের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় আমাদের আজ তাই নূতন করিয়া সাধনার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন নূতন ভাব-প্রবাহে, বিষয়বস্তুর বিচিত্র সম্ভারে, চিন্তার রাজ্যে নব নব উদ্ভাবনী-শক্তিতে দেবীর অর্ঘ্য-উপচার সাজাইয়া তুলিতে হইবে। নূতন নূতন সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতাকে বর্জন করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আনন্দ-মূলক সাহিত্যের পাশাপাশি জ্ঞানমূলক ও শিক্ষামূলক সাহিত্যের পরিধি বিস্তারে যত্নবান হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে না।

বাঙলার বাহিরে যেখানেই বঙ্গসন্তান থাকুক না কেন, তাঁহাদের একটি বড় দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে হইবে। এক দিকে সেই প্রদেশের ভাষা তাঁহাদের শিখিতে হইবে, সেখানকার সুখদুঃখের সমভাগী হইতে হইবে, অপর দিকে বাঙলা ভাষায় পঠন-পাঠন, আলাপ ও আলোচনা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে চলে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি সদা-জাগ্রত সৈনিকের মত রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সুখের ও আনন্দের বিষয় যে, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি এই বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন। এই কমিতির চেষ্টায় বঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পঠন-পাঠন ও আলোচনার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, কটক, সাগর, এমন কি রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়েও বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন ও পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টাও এই সমিতি করিতেছে। এই কার্যে

বাঙালী সাহিত্যসেবীদের সহায়তা, এবং বিত্তশালীদের দান সর্বসময়েই বিশেষভাবে কাম্য। সমিতির এই মহান কার্যে অনুপ্রেরণা যোগাইবার ভার বাঙালীমাত্রেরই লওয়া কর্তব্য।

আজ যাঁহারা এই মহাসম্মেলনে সম্মিলিত হইয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার অখণ্ডরূপ প্রচার করিবার জন্য, সাংস্কৃতিক দূত-রূপে এক নূতন সংগঠনী শক্তিতে নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের আহ্বানে করিতেছি। নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রকে তাঁহারা প্রসারিত করিয়া দিন। ভাষার দৈন্য ঘুচাইয়া নব নব শব্দ-সম্পদ সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব ভাষাকে তাঁহারা শক্তিশালী করিয়া তুলুন। বাঙলার সাহিত্যসেবীদের নিকটও আমি সেই নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। অপরিমেয় প্রাণ প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে তাঁহারা নূতন বাঙলা গড়িয়া তুলুন। ভাষাকে তাঁহারা এমন রূপ দিন যাহাতে আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও সৃষ্টিতত্ত্ব সহজেই পৌঁছাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই ভাষার এই সহজবোধ্য রূপ যাহাতে ফুটিয়া উঠে, তাহার জন্য পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজ নূতন সাহিত্য-পথিক ও চিন্তানায়কদের সেই কাজ হাতে লইতে হইবে। তবেই ভাষা সৃষ্টির একটা সার্বজনীন সার্থকতা ফুটিয়া উঠিবে। জনমনের সংস্পর্শে সাহিত্যকে নূতন রূপ দিতে পারিলে শিক্ষার আলোক চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। তাহাতেই দেশের সত্যকার মঙ্গল সাধিত হইবে। কেবলমাত্র বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধেই আমি একথা বলিতেছি না, ভারতের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে এই গণ-সংযোগ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজ সেই শুভদিন সমাগত—শুভকার্যে বিলম্ব ঘটিলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। তাই এই শুভলগ্নে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িতে হইবে। বঙ্গ-ভারতীর অপূর্ব দান ও প্রেরণার কথা স্মরণ রাখিয়া ভারতীয় অখণ্ড সংস্কৃতির রূপ ও অতীত ঐশ্বর্যের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া ভবিষ্যতের গরিমা উজ্জ্বল দিকচক্রবাল জয় করিবার জন্য আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিধাতার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইবে—আমরা জয়যুক্ত হইব।—বন্দে মাতরম্।

স্বামী প্রণবানন্দজী

বর্তমান সময়ে বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির দেহে শক্তি-সঞ্চার কার্যে অগ্রণী হইয়া ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় ভারতের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন। আমাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তাকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিন্দুধর্মের স্বর্ণ-পেটিকার মধ্যে সুরক্ষিত আছে, তাহার পুনঃ প্রচার করিতে হইবে। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ সেই হিন্দু-ধর্মের পুনঃ প্রচারের পবিত্রকার্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। হিন্দুধর্মের যে দিকটা কেবল মনন ও নিয়ম পালন লইয়াই ব্যাপৃত, ঘটনাচক্রে এবং অদৃষ্টদোষে বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত উদ্যম সেই দিকেই ব্যয়িত হইতেছিল। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, যুগ-পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেক হিন্দুকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অবশ্য পালনীয় বীরব্রতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আচার্য প্রণবানন্দ স্বামীজী প্রচলিত অংগহীন হিন্দুধর্মকে পূর্ণাংগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দুজাতিকে যুগোচিত মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সম্মেলনে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান্

ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। তাঁহারই দূরদৃষ্টি, বহু বর্ষ পূর্বে হিন্দু-সমাজের রক্ষা ও সংগঠন কল্পে 'মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল' গঠন আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিল। তাঁহারই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ফলে শক্তি-সমন্বিত এই ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' সম দুর্বল ও লাঞ্ছিত হিন্দুকে বিপদে উন্নতশির হইতে শিক্ষা দিতেছেন, ছিন্নভিন্ন ও আত্মকলহপরায়ণ হিন্দু-সমাজকে সংগঠিত একতাবদ্ধ হইবার পথ দেখাইতেছেন, দুঃস্থ ও বিপন্ন হিন্দুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, স্বদেশে বিস্মৃতিমগ্ন হিন্দুকে তাহার ধর্মের ও সভ্যতার গৌরবগথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর উপদেশ ও অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বাণী বহনকারী ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ পৃথিবীর দূর-দূরান্তে অবস্থিত স্থানসমূহে হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের অভ্যন্তরে গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে সংঘ জাতির সেবাকার্যে যেমন তৎপরতা ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্ব আফ্রিকাতেও তেমনি হিন্দুধর্মের মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত অনগ্রসর ও অনাদৃত অঞ্চল হিন্দুধর্মের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, হিন্দু-সন্ন্যাসীর পবিত্র গৈরিক বসন চক্ষে দেখে নাই, আজ সেখানকার জনগণ শাশ্বত সনাতন বেদবাণী শ্রবণ ও নির্মল আধ্যাত্মিক চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমার মনে হয়, ভারত-সেবাশ্রম-সংঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ—সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেশকে ও জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই। ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় ভারতের দিব্য দ্রষ্টা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমি আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

একখানি চিঠি

(১৯৫৩ সালের ৬ই জুন শ্রীনগর সেণ্ট্রাল জেল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে লিখিত)

বৌদি,

সেদিন তোমাকে চিঠি লিখে রাখার পর ডাকের চিঠি এল। এক সঙ্গে তোমার আগের লেখা বাঙলায় তিনখানা চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। এই সব চিঠি আগে আমাকে দেওয়া হয়নি—হয়ত যিনি বাঙলায় লেখা চিঠি পড়ে 'পাস' করবেন—তিনি ছিলেন না। আমার সব চিঠি ঠিক পেয়েছ আশা করি। আমি মোটের উপর ভালই ছিলাম —কিন্তু আবার দুদিন ডান-পায়ে ব্যথা বেড়েছে। কেন এমন হয় জানি না। ডাক্তার কাল এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন যেন না দাঁড়াই —এই বলেন। এমনি ত বেড়াবার উপায় নেই—বাগানের মধ্যে ছাড়া —তাতে কোন রকম ক্ষিধে হয় না—তার উপর যদি একেবারে শুয়ে বা বসে থাকতে হয়, তাহলে আরো মুশকিল। ক'দিন আবার সন্ধ্যার পর একটু জ্বর হচ্ছে—বেশী নয়, ৯৯°। চোখমুখ জ্বালা করে। ওষুধ খাচ্ছি। খাওয়া ত খুব সাবধানে খাই। সিদ্ধ খাওয়া—তরকারি। মাছ পাওয়া যায় না। দুদিন এনেছিল। ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। তবে সাড়ে পাঁচটার আগে উঠি না। মুখ ধুয়ে একটু বাগানে ঘুরি— ঘরে বসি—সে সময়টা খুব সুন্দর থাকে—চণ্ডীপাঠ করি। ৭টায় এক কাপ চা। তারপর বসে পড়া ও কিছু লেখা। সাড়ে আটটার আগে বাগানে গিয়ে বসি—রোদ আসে সেখানে তখন। মুখ পুড়ে কালি হয়েছে—তাই মুখটা গাছের ছায়ায় রাখি ও তার জন্য চেয়ার সরাতে সরাতে চলতে হয়। তখন খাবার আনে। দুখানা ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট

—হাসু(১) পাঠিয়েছে—একটু মাখন দিয়ে আধসিদ্ধ ডিম একটা ও এক কাপ দুধ কফি। তারপর সেখানেই বসে থাকি—বা একটু ঘুরি। বই আর বই—এই চলে—বারোটা অবধি। তখন স্নান করি—ও প্রায়ই বাগানে গাছতলায় খাই। একঘণ্টা বিশ্রাম হয়—চিঠি লিখি বা পড়ি। সাড়ে তিনটায় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আসেন—খবরের কাগজ বা ডাক নিয়ে। খালি চা—লেবু দিয়ে—ও ফল (যদি থাকে) খাই। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা সন্ধ্যা পর্যন্ত আলো থাকে। তারপর ঘরে এসে বসি। বই, কবিতা, গীতা—এই সব চলে তখন—পৌনে নটা পর্যন্ত। তখন বারান্দায় খাওয়া হয়—দুবেলার খাওয়া একই। একখানা রুটি খাই। সিদ্ধ তরকারি—কোনদিন মাংস—দই দুবেলাই খাই। মিষ্টি দু-একদিন এনেছিল। রাত ১০টা পর্যন্ত জেগে থাকি। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম প্রথম রাত ভাল হয় না। তারপর একঘুমে ভোর হয়। হাতে অগাধ সময়—ভাবতে আরম্ভ করলে তার সীমা পাওয়া যায় না। শুধু যা দিন, বছর পার হয়ে গেছে তার কথা ভাবি না—তার ভিতরেও অনেক জিনিস আছে যা দুঃখ ও সুখ মিশান, কাজেই তাদের ভুলব কেমন করে—তাই ভাবি সেই সব কথা। তার সঙ্গে বর্তমান সময়ের কথা ভাবি—মানুষ ও ঘটনা—ছবির মত মনে আসে—কে কোথায় আছে, কি করছে, কোন্ ঘটনা কেমন ঘটছে—নানা ভাবে এই সব মনে আসে। আবার যখন ভাবি অনিশ্চিত দূর ভবিষ্যতের কথা—তখন আর একরকম ভাবে সব ভাবনা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখি—পরাজয়ের মধ্যে বিজয় দেখি—সবার ভাল দেখি। বেশী দেখেছি এই ক'দিনে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ অথচ কত গর্বিত ও মদমত্ত আমরা—অথচ তা জানি না। বুঝি না যে যন্ত্রচালিত হয়ে চলেছে এ জগৎ ও যাঁর কৃপায় এই সৃষ্টির জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ হচ্ছে তাঁর কথা ভাবি না। জীবনের প্রায় সময় কেটে এল—কি করলাম এর ভিতর জানি না। কত ছোট কত বাজে কথায় ও কাজে সময় কেটে গেছে—ভুল ও অন্যায় কত করেছি তাই ভাবি। বই পড়তে খুব ভাল লাগে, তুমি জান। বই পড়ছি নানা বিষয়ের উপর—নতুন ও পুরাতন—আর শিখছি কত নতুন

(১) কনিষ্ঠা কন্যা।

করে। লিখতে খুব ইচ্ছা করে—কিন্তু ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। বাবার জীবনী একটা লেখা হল না—এই ত্রিশ বৎসরে—এর জন্য দুঃখ হয়। এখনও চেষ্টা করলে তাঁর সময়ের অনেক কথা লেখা ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। ক'দিন ধরে আমারই ইচ্ছা করছে এই লিখতে। নিজের জীবনেও কম অভিজ্ঞতা হয়নি—তাও লিখতে মন চায়। ভাবি তোমাদের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, নাতিনাতনীর কথা—আর যে হাজার হাজার ছেলেরা আজ বন্ধ জেলে রয়েছে তাদের কথা। কতদিন এভাবে থাকব জানি না। ভবিষ্যতে কাজ কি করব তাও জানি না। তবে মনে কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং আগে যে অফুরন্ত বিশ্বাস নিজের উপর রাখতাম, তা এ ক'দিনে রাখতে পেরেছি—সেই অজানা পরমশক্তির উপর—যাঁর নির্দেশ বিনা আমরা চলতে বা বাঁচতে পারি না। এতে আনন্দ হয়, মনে জোর হয়। সবাই ভাল থাক ও সুখী হও। আজ এই থাক। চিঠি দিও। তোমার মেজঠাকুরপো।

বাঙলার রঙ্গালয়

বর্তমানে ভারতে নাট্যাভিনয়ের যে প্রচলন আমরা দেখিতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে তাহার মূল নিহিত রহিয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়ার দিকে যে কয়জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক কলিকাতায় সখের নাট্যশালা নির্মাণ করিয়া নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য অভিনয় করিতেন, তাঁহারাই হইতেছেন বাঙলাদেশে আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রবর্তক। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙলাদেশের লোকেদের আমোদ-প্রমোদের প্রধান বিষয় ছিল যাত্রা, কথকতা, কবিগান, তর্জা ও আখড়াই। ভারতের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া অভিনয় করার রীতি অত্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল। রঙ্গপীঠ, প্রেক্ষাগৃহ, নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং অভিনয়ের নানা উপকরণের কথা সুবিখ্যাত ভরতনাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। প্রাচীন ভারতে একদিন নাট্যকলা উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন গৌরবের দিনগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া বাঙালীরা তাঁহাদিগের মূল্যবান্ কীর্তিগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজদের সংস্পর্শে আসিয়া রঙ্গাভিনয়ের প্রতি তাঁহাদিগের সুপ্ত প্রীতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। লালবাজারের 'ওল্ড প্লে হাউস' কলিকাতায় ইংরাজদের প্রথম নাট্যশালা। ১৮৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধকালের কিছু পূর্বে ইহার পত্তন হয়। হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ ভ্রাম্যমাণের চেষ্টায় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনীত বাঙলা নাটকে ইউরোপীয় নাটকের আংগিক সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের অনুমতিক্রমে কলিকাতার মধ্যস্থিত 'ডোমতলায়' ১৭৯৫ সালে তিনি একটি ভারতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে The Disguise এবং Love is the Best Doctor নামে দুইখানি ইংরাজি নাটকের স্বয়ং বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙালী নট-

নটীদের দ্বারা যথাক্রমে নভেম্বর ১৭৯৫ এবং মার্চ ১৭৯৬ সালে তিনি অভিনয় করান। ইতিমধ্যে ইংরাজদের রঙ্গালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও ১৮৩১ সালের পূর্বে বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইংরাজদের বহু নাট্যশালার মধ্যে বিখ্যাত 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' ১৮১৩ সালে স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন ধনী ব্যক্তি ছাড়া এই রঙ্গালয়ের প্রতি সাধারণ বাঙালীদের প্রথমে কোন আকর্ষণ ছিল না। ১৮৪১ সালে "সাঁ সুসি" নামে যে ইংরাজি রঙ্গালয়টি স্থাপিত হয়, তাহার অভিনয়-খ্যাতি হইয়াছিল প্রচুর। এই খ্যাতির কারণ হইতেছে এই, সেখানে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেশ হোম্যান উইলসন, বোর্ডের মেম্বার টরেন্স, বোর্ডের জুনিয়র মেম্বার এইচ, এম, পার্কার ও ব্যারিস্টার হিউম (যিনি পরে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন) প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ইউরোপীয়েনরা অভিনয় করিতেন। যে সব ধনী বাঙালী দর্শক-হিসাবে এই সব রঙ্গালয়ে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা এখানকার অভিনব অভিনয়-চাতুর্য, বিশেষ করিয়া অপরূপ দৃশ্যাবলী এবং তাহাদিগের ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় আদর্শে নিজেদের আমোদ-প্রমোদকে উন্নত ও সুশোভিত করিবার বাসনা তাঁহাদিগের মনে তখন জাগিয়াছিল।

এইরূপে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একখানি জনপ্রিয় নাটক বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল এই, ইহা ইংরাজি রঙ্গমঞ্চের হুবহু অনুকৃতি না হইলেও ইহার মধ্যে নূতনত্ব আনিবার একটা সুস্পষ্ট চেষ্টা ছিল। মেয়েদের চরিত্রগুলি বারনারীদের দ্বারা এবং নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বাড়ির বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হইয়াছিল। দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দকেও দৃশ্যানুযায়ী স্থান পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে স্থান-পরিবর্তনের সময় আসন সংগ্রহের জন্য অনবরত হুটোপাটি হওয়া সত্ত্বেও, অভিনয়ের মধ্যে নূতনত্ব থাকায়, দর্শকদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি হইয়াছিল প্রচুর এবং সুখ্যাতির সহিত ব্যয়ের পরিমাণটিও তুলনীয়; কারণ ব্যয় হইয়াছিল সর্বসমেত দুই লক্ষ টাকা। অভিনয়ের সুখ্যাতির জন্য এই নাটক তিন-চার বছর ধরিয়া সুযোগ-

সুবিধা মত নানা স্থানে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা পতিতা নারীদের দ্বারা অভিনীত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলনও হইয়াছিল। মজার কথা হইতেছে এই, এই বিরোধীদলের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ইংরাজও ছিলেন। যাহা হৌক, দৃশ্যপটাদিসহ বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়-কৌশল ভবিষ্যতে নূতন নাটকের প্রযোজনায় একটা সাধারণ নাট্য-রীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু অসুবিধা হইল, এই সব তরুণ মনের আশা পুরাইতে পারে এমন কোন বাঙলা নাটক তখন ছিল না। খাঁটি বাঙলা নাটকের অভাবে ইংরাজি নাটকের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা ইংরাজি নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অভিনয় অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের নাট্য-পিপাসা দূর করিতে পারে নাই; কারণ ইহা তাহাদিগের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। ইতিমধ্যে তাহারা নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্বভাবতঃই উপযুক্ত বাঙলা নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে দুই একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় দেখার সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি এত দোষ-ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, তাহা জন-সাধারণের ক্রমবর্ধমান নাট্য-পিপাসা ঘুচাইতে পারে নাই। ইংরাজি নাটকের অভিনয় সৌকর্যে যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে এই সব নাটকে ভাষা, শব্দ ও রচনারীতির অপপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুর আকর্ষণ-হীনতা, নাট্যকারদের নাট্য-প্রয়োগ-কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, যেমন 'প্রবেশ' ও 'নির্গমন' এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে নাটকীয় কাহিনীকে বিভাগ করার বিষয়ে যে সকল ত্রুটি দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের একখানি বাঙলা নাটক অভিনয় না হওয়া পর্যন্ত, বাঙলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অবস্থা এইরূপ চলিয়াছিল।

ইংরাজি ১৮৫৭ সাল বাঙলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময়ে এমন একটি নাটকের প্রকাশ হইয়াছিল, যাহার উদ্দেশ্য এবং মৌলিকতা দর্শকদের বহুদিনকার আকাঙ্ক্ষিত নাটকের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল এবং ইংরাজি নাটক অভিনয়ের যে প্রথা এতদিন প্রচলিত ছিল, তাহার মূলে আঘাত হানিয়াছিল। সেই নাটকের নাম

'কুলীনকুল-সর্বস্ব'। সেই নাটক বাঙালীদের কাছে সহজেই গ্রহণীয় হইয়াছিল। তাঁহারা এই ভাবিয়া খুশী হইয়াছিলেন যে, যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, বহুবিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথার অতিশয় ক্ষতিকর দোষগুলি প্রদর্শন করাইয়া সমাজের মঙ্গল করা। ১৮৫৭ সাল আর এক বিষয়ে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয়। বর্তমান কালে আমরা যে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের ব্যবহার দেখিতে পাই, তাহার প্রচলন এই কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটকেই প্রথম দেখা গিয়াছিল। তদানীন্তন কালের রঙ্গমঞ্চে নাট্য-প্রয়োগ বিষয়ে যতখানি কৌশল ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করা সম্ভব, তাহা এই নাটকের অভিনয়ে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বস্ত্রের দ্বারা রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার মৌলিকতা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল এবং আরও মৌলিক নাট্যাভিনয়ের জন্য তাহারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

এখানে এই কথা বলা আবশ্যক যে, এই নাট্যাভিনয়ের পরে যে বাঙলা নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সবই ছিল সংস্কৃতের অনুবাদ। ইহা হইতে এই তথ্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, যে যুগে সংস্কৃত নাটক হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া অভিনয় করার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, সে যুগ আর নাই। এ কথা সত্য, ১৮৩২ সালে মৌলিক বাঙলা নাটকের যেমন অভাব ছিল, এ-যুগেও তেমনি ছিল। তবে একথা দ্বিগুণ জোরের সহিত বলা চলে, সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইতেই মৌলিক বাঙলা নাটক লেখার প্রেরণা আসিয়াছিল এবং ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সেই মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল। আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া, 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' হইতে 'রত্নাবলী'র অভিনয় পর্যন্ত নাটকীয় ইতিহাসের ঘটনাবলী কালানুসারে সাজাইয়া দিলে বুঝিবার পক্ষে আগ্রহ জাগিবে। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এ-যুগকে প্রধানত অনুবাদের যুগ বলা হয়।

১৮৫৭—(১) **কুলীনকুল-সর্বস্ব** নাটকের প্রথম অভিনয় হয় পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের চড়কডাঙ্গাস্থিত জয়রাম বসাকের বাড়ি। অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র পরবর্তীকালের ম্যানেজার,

অভিনেতা ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এই অভিনয়ে বিহারীলাল একটি স্ত্রী-চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) কুলীনকুল-সর্বস্বের অভিনয়ের পরের দিন আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়িতে **শকুন্তলা** অভিনয় হয়। সাতুবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত হইতে শকুন্তলার অনুবাদ করা হয়। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র ভাবী স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন। দর্শক-হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু (পরে মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

(৩) রামনারায়ণ তর্করত্নের দ্বারা অনূদিত **বেণী-সংহারের** প্রথম অভিনয় হয়, মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে। অভিনেতাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার, বিখ্যাত ডব্লু, সি, ব্যানার্জি) এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

(৪) বেণী-সংহারের অভিনয়ের আট মাস পর কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে **বিক্রমোর্বশীর** বঙ্গানুবাদের প্রথম অভিনয় হয়। বেণী-সংহারের অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে বিক্রমোর্বশীর বঙ্গানুবাদ করেন এবং স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই অভিনয় দেখিবার জন্য বাঙলা সরকারের তখনকার কর্মসচিব সার সিসিল বিডন এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।

১৮৫৮—এই বছরের ৩১শে জুলাই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে **রত্নাবলীর** বঙ্গানুবাদের প্রথম অভিনয় মহাধুমধামে সম্পন্ন হয়।

১৮৫৮ সালে অর্থাৎ রত্নাবলীর অভিনয়ের বছরে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি আর একটু প্রসারিত হয়। এতদিন পর্যন্ত অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় চলিয়া আসিতেছিল, এবার তাহার একটু পরিবর্তন হয়। পাইক-পাড়ার রাজাদের বদান্যতায় তাঁহাদেরই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে রত্নাবলীর অভিনয় হয়। এই নাট্যাভিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অভিনয় কালে ইংরাজি রঙ্গালয়ের অনুসরণে ঐকতান-বাদনের প্রথম প্রবর্তন করা হয়। বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে রত্নাবলীর অভিনয় আরও একটি বিষয়ে স্মরণীয়। ইহা মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক এবং আরও অনেক মৌলিক বাঙলা নাটকের রচনা-বিষয়ে পথপ্রদর্শক। রত্নাবলীর পরে আরও কয়েকখানি নাটকের অভিনয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮৫৯—(১) সেপ্টেম্বর মাসে মধুসূদনের **শর্মিষ্ঠা** নাটকের প্রথম অভিনয় হয় বেলগাছিয়া থিয়েটারে। রত্নাবলীর ন্যায় এ নাটকের অভিনয় অতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয় এবং রত্নাবলীর ন্যায় নাট্যকার নিজেই এ নাটকের একটি ইংরাজি অনুবাদ করেন। ইংরাজি নাটকের অনুসরণে এ নাটকের আংগিক রচনা করা হয় এবং শিক্ষিত লোকেরা ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন; কিন্তু একদল প্রাচীনপন্থী পন্ডিত ইহার বিরোধী ছিলেন। শর্মিষ্ঠা প্রকাশের পর রামনারায়ণের খ্যাতি মধুসূদনে আরোপিত হইয়াছিল। তখন লোকে সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্যে নাট্যাভিনয় দর্শনে ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। তাই তাহারা সংস্কৃত নাটকের দাঁতভাঙ্গা শব্দাবলী ত্যাগ করিয়া সহজ প্রথায় লেখা ইংরাজি নাটকের আদর্শে গঠিত বাঙলা নাটকের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল।

(২) **শকুন্তলার** দ্বিতীয় অভিনয় হয় জনাই-এর বিখ্যাত জমিদার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহিরীটোলার বাস-ভবনে।

১৮৬০—সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষা ও পরিচালনায় বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটিস্থিত গোপালচন্দ্র মল্লিকের গৃহে **বিধবা-বিবাহ** নাটকের অভিনয় হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেলগাছিয়া থিয়েটারের খ্যাতিকে নিষ্প্রভ করা এবং সেই কথা মনে রাখিয়া ইহার উদ্যোক্তারা বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। একজন বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রকরের দ্বারা দৃশ্যপট অঙ্কিত করানো হইয়াছিল এবং গান ও ঐকতান-বাদনের ভার সুযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষে'র মতে, ইহার অভিনয় বেলগাছিয়া থিয়েটার অপেক্ষা কোনক্রমেই ন্যূন হয় নাই এবং ইহাতে সর্বসমেত চার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬৪—(১) মধুসূদনের **একেই কি বলে সভ্যতা** রাজা দেবীকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়। শোভাবাজারের রাজারা 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ইহা চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষের বহির্বাটীতে স্থাপন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান তিনটি অভিনয়ের আয়োজন করেন, তন্মধ্যে একটিতে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

(২) কালিদাস সান্যালের রচিত **নলদময়ন্তী** নাটক বাগবাজারের গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর অধিনায়কত্বে অভিনীত হয়। অভিনেতাদের মধ্যে একজনের নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নন, ইনি "ল্যাদাড়ু গিরিশ" নামে পরিচিত ছিলেন। দুই বৎসর পরে চটা-

মহেশতলা গ্রামের গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা **ইন্দুপ্রভা** নাটক এই সম্প্রদায় কর্তৃক অন্ততঃ পরপর সাতবার অভিনীত হয়।

১৮৬৫—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে **মালবিকাগ্নি মিত্র** নাটকের অভিনয় হয়। যতীন্দ্রমোহনের গৃহে তাঁহার নিজস্ব একটি নাট্যশালা ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে তাঁহার নিজের লেখা নাটক —**যেমন কর্ম তেমনি ফল, বিদ্যাসুন্দর, মালতীমাধব, উভয়সংকট, চক্ষুদান, বুঝলে কি, রুক্মিণী হরণ** প্রভৃতি অভিনীত হইত। এই সকল অভিনয়ে বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ করা হইত। যাহারা রাজবাড়ির গেটে টিকিট দেখাইতে পারিত না, তাহারা দরওয়ানদের দ্বারা অপমানিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত।

১৮৬৬—(১) বৈশাখ মাসে এই নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছিল—**মহাশ্বেতা, শকুন্তলা,** মধুসূদনের **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ,** নিমাইচরণ শীলের **চন্দ্রাবলী** এবং একখানি প্রহসন—**এরাই আবার বড়লোক।**

(২) চৈত্র মাসে নীলমণি মিত্রের বাড়িতে (স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পৈতৃক বাস-ভবনে) উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা **সীতার বনবাস** অভিনীত হয়।

(৩) মধুসূদনের **পদ্মাবতী** অভিনীত হয় শিমুলিয়ায় (শুঁড়ীপাড়া)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৮৬৭—(১) ১২ই ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাটীতে মধুসূদনের **কৃষ্ণকুমারী** নাটকের অভিনয় হয়। দর্শকদের মধ্যে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন তেইশ বৎসরের যুবক। নায়ক ভীমসিংহের চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। ছয় বৎসর পরে গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকা অভিনয় করিয়া বিহারীলালের খ্যাতিকে ম্লান করিয়া অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

(২) বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লেখা রামনারায়ণ তর্করত্নের **নব নাটক** ৬ই জানুয়ারি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে "জোড়াসাঁকো নাট্য-সমাজে" অভিনীত হয়। এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

(৩) মধুসূদনের **পদ্মাবতী** নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ৩০৯নং আপার চিৎপুর রোডস্থিত বিখ্যাত জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের বাড়িতে। সেখানে নাট্য-শিক্ষক ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং সংগীত-শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ জওলাপ্রসাদ এবং নিতাই চক্রবর্তী।

(৪) ২রা নভেম্বর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়িতে (রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রহসন **কিছু কিছু বুঝি** অভিনীত হয়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নাটক এবং যাত্রা, পাঁচালী ও তর্জার গান লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই প্রহসন-খানি তিনি লিখিয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রহসন 'বুঝলে কি'-র প্রত্যুত্তরে। এই অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, ইহাতে ভবিষ্যৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দুইজন নেতা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং ধর্মদাস সুর প্রথম নাট্য-পরিচালনা ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর নাট্য-শিক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন এবং তদতিরিক্ত 'দন্তবক্র', 'মুরাদ আলি' এবং 'চন্দনবিলাসে'র চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের বিখ্যাত স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস সুর রঙ্গমঞ্চ তৈরি করিয়াছিলেন এবং 'চন্দনবিলাসে'র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৬৮—এই সময়ে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে (রাজবল্লভপাড়া, বাগবাজার) **রত্নাবলীর** পুনরাভিনয় হয় এবং প্রিয়মাধব বসু-মল্লিকের লেখা একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এ-খানি **কিছু কিছু বুঝি-র** বিরুদ্ধে বিষোদ্গার।

তখনকার দিনে এই সব আমোদ-প্রমোদ জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহার প্রভাব কলিকাতার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার চোরবাগান, বহুবাজার এবং সহরতলীর ভবানীপুর ও শিবপুর—এই সব স্থানে নাট্যাভিনয় লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত। কলিকাতার গণ্ডী ছাড়াইয়া ক্রমে চুঁচুড়া এবং মফঃস্বলের সহরেও যে নাট্যাভিনয় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে যে সকল নাট্য-সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বহুবাজারে অবস্থিত "বহুবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ" সবিশেষ খ্যাত। এই প্রতিষ্ঠান রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের অগ্রগতিতে কম সাহায্য করে নাই। কারণ এখানে বহুবাজারের বসুগণ যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সূচনা করেন, তাহাতে মনোমোহন বসুর লেখা নাটকগুলি অভিনীত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। নিকটবর্তী ধর-পরিবারের সহিত একযোগে বসু-পরিবারের মতিলাল বসু ও চুণীলাল বসু নাট্যাভিনয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন অক্লান্তকর্মী এবং

অভিনেতা প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বসুগণ, প্রতি শনিবারে যে অভিনয় হইত তাহার সকল ব্যয় এবং ছয় বৎসর ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে বিশেষ বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা বহন করিতেন। ইহার পরে অর্থের অভাবে এখানকার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। এই বহুবাজার থিয়েটারে মনোমোহন বসুর **"রামের রাজ্যাভিষেক"**, **"সতী"** এবং **"হরিশ্চন্দ্র"** অভিনীত হয়। সংগীত, দৃশ্যপটাদি, বাচন-ভঙ্গী, ঐকতান এবং সাধারণ পরিচালনা বিষয়ে অভিনয় এত সুসংগত হইত যে, তাহার খ্যাতি সহরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় সকল দর্শকই একবাক্যে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৩১ সালের প্রথম বাঙলা নাটকের অভিনয়কাল হইতে এ পর্যন্ত আমরা যত নাটক অভিনীত হইবার সংবাদ পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা ও মূল্য কম নয়। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা যে অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কৃতিত্ব স্বল্প নয়; কিন্তু তাঁহারা যে জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য উৎসুক ছিলেন, সে-কথা বলা যায় না। যদিও এমন এক সময় ছিল, যখন ঠাকুর পরিবারের মধ্যে নিজেদের অভিনয়কে ক্রমশঃ জনপ্রিয় করিবার জন্য বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যাহারা ধনী এবং পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ বিনামূল্যের টিকিটে আমন্ত্রণ জানানো হইত। যাহা হৌক, বিনামূল্যের টিকিট সাধারণ লোকের জন্য ছিল না এবং তাহারা নাট্যশিল্পের প্রতি যতই অনুরাগী হৌক না কেন, তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইত। কিন্তু এখান হইতেই একদল তরুণ উদ্যোক্তার মনে এই চিন্তা জাগিল যে, জনসাধারণের আনন্দের জন্য একটি রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ঠাকুর-পরিবারের অভিনয় উপলক্ষে বিনামূল্যের টিকিট সংগ্রহের যে বাধা এবং প্রবেশের যে কঠিন নিয়ম ছিল, তাহা দেখিয়া একজন দর্শকের মনে হইয়াছিল যে, ঠাকুর-পরিবারের এই রক্ষণশীল নিয়মের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পদমর্যাদা এবং জাতিবর্ণের ভেদাভেদের দিকে না তাকাইয়া নাট্যাভিনয়কে সকলের পক্ষে সহজ করিতে হইবে। এই দর্শকটি আর কেহ নন, তিনি হইতেছেন তরুণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ধনীর সাহায্য ব্যতীত কোন পরিকল্পনা করিতে গেলে, খরচের

দিকটা বাধাস্বরূপ হইয়া ওঠে। তথাপি এক্ষেত্রে নিরাশার গহ্বর হইতে আশার উৎস দেখা দিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, খরচের স্বল্পতার দিক দিয়া যাত্রা পার্টির স্থাপনা করা মন্দ নয় এবং তদনুযায়ী ১৮৬৭ সালে তাঁহারা বাগবাজারে একটি কোম্পানী সৃষ্টি করিয়া মধুসূদনের **"শর্মিষ্ঠা"** অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। কয়েকটি অতিরিক্ত গানের প্রয়োজন হওয়ায় প্রসিদ্ধ গীতকার প্রিয়মাধব মল্লিককে রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি কোন প্রকার উৎসাহ না দেখানোতে উদ্যোক্তারা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করেন। কাজটি গিরিশচন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র চৌধুরীর সহযোগে প্রয়োজনীয় গানগুলি রচনা করিয়া ফেলেন। শর্মিষ্ঠার অভিনয় হয় এবং বাগবাজারে সে অভিনয়ের প্রশংসাও যথেষ্ট শোনা গিয়াছিল। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র থিয়েটার কোম্পানী স্থাপনার বিষয়ে তাঁহার মনোগত ইচ্ছার কথা ভুলিয়া যান নাই, যদিও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অসম্ভব্যতা বিশেষভাবে তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল। যাহা হোক, একটি সুন্দর সুযোগ শীঘ্রই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার **"সধবার একাদশীর"** অভিনয় করাইয়াছিলেন এবং সেই অভিনয় অভূতপূর্ব-ভাবে লোকপ্রিয় হইয়াছিল এবং লোকের মুখে মুখে তাহার আলোচনা চলিতেছিল। বাঙলার তরুণদের মুখে তখন 'নিমচাঁদের' অজস্র প্রশংসা শোনা যাইতেছিল। গিরিশচন্দ্র দূরদৃষ্টির বলে তখনই অল্প ব্যয়ে এই নাটকের অভিনয়ের কথা ভাবিয়াছিলেন। ব্যয়বহুল অভিনয় করিবার ক্ষমতা তখন তাহাদের ছিল না। এই নাটক সামাজিক বিষয়ের হওয়ায়, উদ্যোক্তারা এতদিন পর্যন্ত যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল। পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে কোন খরচ ছিল না, কারণ ইহাতে বাঙালী ঘরের সাধারণ পরিচ্ছদের দ্বারা অভিনয় করা চলিবে। দৃশ্যপট বিষয়ে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাহা মোটামুটি সহজভাবে রচনা করা হইবে। এই প্রস্তাব সুন্দর মনে হওয়ায় তরুণেরা তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গিয়াছিলেন। বাগবাজারের হরলাল মিত্রের লেনে অরুণচন্দ্র হালদারের গৃহে রিহার্সাল আরম্ভ হইয়া গেল

এবং বাগবাজারের সৌখীন দলের যাঁহারা সম্প্রতি "শর্মিষ্ঠা যাত্রা" করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে অভিনেতা বাছাই করা হইল। নাটকের মধ্যে গানের প্রয়োজন হইলে গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করা হইল। ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র মেসার্স এ্যাট্‌কিনসন টিল্‌টন এণ্ড কোম্পানীতে বুক-কিপারের কাজ করিবার সময় সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিবান লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রচলিত জনপ্রিয় হিন্দী গানের রীতি অনুসারে কয়েকটি বাঙলা গান লিখিয়া দিলেন এবং তখনকার রীতি অনুসারে একটি প্রস্তাবনাও লিখিয়া ফেলিলেন। তাহা মূল নাটকে ছিল না।

এই সময়ে একজন নূতন অভিনেতার আগমন হওয়ায় বাগবাজার এমেচার কোম্পানীর শক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তখনই তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি নাম রাখিয়া যাইবেন। তিনি হইতেছেন প্রসিদ্ধ নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। নাটক ও নাট্যাভিনয় বিষয়ে তিনি এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে পরিচালক গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সধবার একাদশীর রিহার্সালে উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অর্ধেন্দুশেখরের এই উপস্থিতি গিরিশচন্দ্রের সহিত যে মিলন ঘটাইয়াছিল, তাহাতে এই দুই মনীষীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল, এবং আজিকার দিনে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই দুই জনের মিলন। ইতিপূর্বে উভয়পক্ষীয় কয়েকজন বন্ধুর নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুর নাট্য-প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলেন এবং শুনিয়াই সানন্দে তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়াছিলেন। অর্ধেন্দু ছোট ছোট ভূমিকাগুলি শিখাইবার ভার লওয়ায়, গিরিশচন্দ্র দিনের বেলায় অফিস ও রাত্রিতে রিহার্সাল—এইরূপ কঠিন পরিশ্রম হইতে কিছুটা রেহাই পাইয়াছিলেন। অর্ধেন্দুর অসাধারণ অভিনয় শক্তি শীঘ্রই সকলের দৃষ্টিগোচর হইল এবং অরুণচন্দ্র হালদার যিনি 'কেনারামের' ভূমিকা করিতেছিলেন, তিনি সানন্দে তাহা অর্ধেন্দুকে ছাড়িয়া দিলেন।

তারপরে আসিল ১৮৬৯ সালের (১২৭৫ বঙ্গাব্দের) স্মরণীয় সপ্তমী পূজার দিন। সেদিন দীনবন্ধুর প্রথম সৃষ্ট নাটকের অভিনয় হইল এবং সেদিন যুবকগণের বহু দিনের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা

সার্থকতা লাভ করিল। যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখরকে বাদ দিয়া বিশিষ্ট হইতেছেন —নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ক্যাপ্টেন বেল)। ইঁহারা সকলেই পরবর্তীকালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের অভূতপূর্ব নাম হইয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্রের 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় অভিনয় পূর্ববর্তী সকল অভিনেতাদের গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছিল। যদিও মঞ্চে এই তাঁহার প্রথম অবতরণ, তথাপি নাটকের অন্তর্গত প্রচুর ইংরাজি উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং তাঁহার দ্বারা প্রধান চরিত্রটির সম্পূর্ণ মর্ম-গ্রহণ, দর্শকবৃন্দের ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই অভিনয়ের কথা বহুদিন পর্যন্ত লোকে স্মরণে রাখিয়াছিল এবং এখনও অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই কথা বলিয়া থাকেন। উদ্যোক্তারা সেদিন কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই যে, যে বীজ খেলার ছলে এবং আমোদের জন্য সেদিন তাঁহারা প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে বনস্পতির রূপ ধরিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় চারিদিকে বিস্তারিত হইবে। যাহাকে আমরা বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বলিয়া থাকি, দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' তাহারই অগ্রদূত, একথা দীনবন্ধুকে তাঁহার **'শাস্তি-কি-শান্তি'** নাটক উৎসর্গ করার কালে গিরিশচন্দ্রই বলিয়াছিলেন। সেদিন দীন-বন্ধুকে বিনম্রচিত্তে প্রণাম জানাইয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, দীনবন্ধুই বাঙলা রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই নাটক কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে অন্ততঃ ছয় বার অভিনীত হইয়াছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ অভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগের-টিতে নাট্যকার স্বয়ং, তাঁহার কয়েকজন বন্ধু এবং সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন, শোভাবাজারের "বিজু বাহাদুর", কলিকাতা পৌরসভার উপ-সভাপতি গোপাললাল মিত্র এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দুর্গাদাস কর। 'নিমচাঁদের' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা দেখিয়া নাট্যকার এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি এই বলিয়া গিরিশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়া-ছিলেন,—"তুমি না থাকিলে এই নাটক অভিনয় হইতে পারিত না। মনে হয়, নিমচাঁদ কেবলমাত্র তোমারই দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য সৃষ্ট

হইয়াছে।” ‘জীবনচন্দ্রের’ ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ও নাট্যকারের নিকট হইতে কম প্রশংসা পায় নাই। ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে অর্ধেন্দু যখন ‘জীবনচন্দ্র’রূপে রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহিরে যাইবার সময় ‘অটল’-কে লাথি মারিয়া নাট্যকারের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন নাট্যকার তাঁহার মহানুভবতার বশে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইহা নাট্যকারের কল্পনাকে নিশ্চিতরূপে উন্নত করিয়াছে। চতুর্থ অভিনয়ও যে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, বাবু (পরে বিচারপতি) সারদাচরণ মিত্র নিজে দর্শক-হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ‘বঙ্গদর্শনে’ যে প্রশংসাসূচক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। চোরবাগানের অধিবাসী বিখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে যে সপ্তম অভিনয় হয়, তাহার বিশেষ আকর্ষণ এই ছিল, সেখানে এই নাট্যকারের লেখা “**বিয়ে পাগলা বুড়ো**” নামে একটি নূতন প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনের প্রস্তাবনা-হিসাবে গিরিশচন্দ্র নিম্নের কয়েকটি চরণ লিখিয়াছিলেন এবং সধবার একাদশীর অভিনয়-অন্তে ‘নিমচাঁদের’ বেশে তিনি আবৃত্তি করিয়া নূতন প্রহসনের অভিনয়-সূচনার সংকেত দিয়াছিলেন।

“মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং।
বাসর ঘরে টোপর পরে কিবা বিয়ের ঢং॥
আয়না-নসে, রতা কোথা, যা পারিস্ তা বল।
ক্ষমা করবেন দোষ আমার রসিক মণ্ডল॥
আস্‌ছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুব্‌নো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার, ফুরালো আমার কথা॥”

অর্ধেন্দু এবং রাধামাধব যথাক্রমে ‘রাজিব’ এবং ‘রতা’র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই উৎসাহী দলের পরবর্তী কৃতিত্ব হইতেছে, দীনবন্ধু মিত্রের আর একখানি নাটক “**লীলাবতীর**” অভিনয়। এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য একাধিক ছিল এবং ইহা যে কেবল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের উন্নতির সহায়তা করিয়াছিল তাহা নয়, ইহা বাঙলায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের সহায়ক

হইয়াছিল। লীলাবতীর অভিনয়ই "ন্যাশনাল থিয়েটার" স্থাপনার সূত্রপাত করিয়াছিল। সে ইতিহাস যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি চিত্তাকর্ষী। সধবার একাদশীর অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া দীনবন্ধু গিরিশ-চন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইহার পরে যেন তাঁহার নূতন নাটক লীলাবতীর অভিনয় আয়োজন করা হয়। গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া বইখানি রিহার্সাল দিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তারা পাড়া হইতে যে সামান্য চাঁদা তুলিয়াছিলেন, তাহা গোবর্ধন নামে একজন দেশী শিল্পীর দ্বারা একটিমাত্র দৃশ্যপট অঙ্কিত করাইতে ব্যয় হইয়া যায়। অভিনয়কে উন্নত করার কল্পনা গিরিশচন্দ্রের মনে চিরদিনই ছিল এবং সেইজন্য তিনি একটি স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া অভিনয়কালে দৃশ্যপট ব্যবহার করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহার এই কল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে আর একজন উৎসাহী ব্যক্তির যে আন্তরিক সমর্থন ছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি হইতেছেন গিরিশচন্দ্রের শ্যালক, ব্রজনাথ দেব। তিনি এবং গিরিশচন্দ্র টাকা তুলিবার জন্য একটি সুন্দর মতলব করিয়াছিলেন। উভয়েই মেসার্স এ্যাট্‌কিন্‌সন টিলটন এণ্ড কোম্পানীর মুহুরী ছিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, ঐ কোম্পানীতে কাজ করিয়া তাহাদিগের যে দস্তুরি পাওনা হইয়াছিল, তাহা একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য ঐ কোম্পানীর দালালদের নিকট তাঁহারা অনুরোধ করিবেন। এ-পর্যন্ত ঐ টাকা তাঁহারা কখনো দাবি করেন নাই। ঐ টাকা পাইয়া শ্যামপুকুরের একটি গৃহ-প্রাঙ্গণে তাঁহারা একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ব্রজনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অচিরেই মৃত্যুকে বরণ করিলেন। রঙ্গমঞ্চ তৈরির কাজ বন্ধ হইয়া গেল এবং তক্তাগুলি খুলিয়া নিকটস্থ বাগবাজারের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী লেনে ধর্মদাস সুরের বাড়ির সামনে একটি জমিতে তক্তাগুলি খাটাইয়া রঙ্গপীঠ তৈরি করা হইল। এই সময়ে আকস্মিকভাবে একজনের সাহায্য পাওয়া গেল। ম্যাকলীন নামে একটি দরিদ্র ইংরাজ নাবিক মাঝে মাঝে বাগবাজার অঞ্চলে ভিক্ষায় আসিত।

জাহাজে ভ্রমণকালে সে রং তৈরির কাজ শিখিয়াছিল এবং বাগবাজারের সকল লোক তাহার এই গুণের কথা জানিত। ধর্মদাস যখন দৃশ্যপট অঙ্কনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই ম্যাকলীনকে কাজে লাগাইবার কথা প্রথম তাঁহার মনে হইয়াছিল। তিনি ম্যাকলীনের সহিত এই চুক্তি করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে খাইতে দিবেন এবং তাহার পরিবর্তে সে দৃশ্যপট অঙ্কিত করিবার জন্য রং তৈরি করিয়া দিবে এবং রঙ্গমঞ্চের তক্তাগুলি পাহারা দিবে। তাঁহারা যখন রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের এই প্রকার প্রাথমিক কাজগুলি করিতেছিলেন, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে বাগবাজারের দলের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, 'লীলাবতী' নাটকখানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবর্তিত এবং সংক্ষিপ্ত হইয়া চুঁচুড়াতে অভিনীত হইয়াছে। সে অভিনয়ের পরিচালনা করিয়াছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই সংবাদে আরও বলা হইয়াছিল, সে অভিনয়ের খ্যাতি সারা শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একটি অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বিদলের এই সাফল্যে বিষণ্ণ হইয়া নগেন্দ্র, অর্ধেন্দু, ধর্মদাস এবং আরও কয়েকজন তৎক্ষণাৎ গিরিশচন্দ্রের নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং বলিলেন, "আমরা চুঁচড়োর দলের কাছে হেরে যাব, আর তাই তুমি দেখবে?" ইহাতে উৎসাহিত হইয়া গিরিশ খুবই জোরের সহিত বলিলেন, "একটি কথাও না বদলিয়ে আমরা এই নাটক অভিনয় করবো এবং চুঁচড়োর দলকে যে কোন উপায়েই হোক হারিয়ে দেব।" প্রত্যেক সভ্যই আরও উৎসাহ এবং শক্তি সহকারে নিজ নিজ কাজ দিন-রাত্রি খাটিয়া সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নাট্য-শিক্ষার কাজ গিরিশচন্দ্র নিজে লইলেন এবং তাঁহার ক্ষমতামত সকলই শিখাইলেন। সধবার একাদশীতে যেমন গান লিখিয়াছিলেন, তেমনি মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত এই নাটকের জন্যও গান লিখিলেন। ধর্মদাস অতি সত্বর দৃশ্যপট আঁকা ও রঙ্গমঞ্চ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার পরিবর্তে সেখানকার কাজের ভার লইলেন একটি মহাপ্রাণ যুবক (অমৃতলাল বসু)। প্রারম্ভিক কার্য শেষ হইলে, বাগবাজার দলের সমবেত চেষ্টায় জুলাই মাসের ১৮৭১ সালে লীলাবতীর অভিনয়

সফল হইল। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের গৃহে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় হইল। ইতিমধ্যে বাগবাজার দলের নাম হইয়াছিল "ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল থিয়েটার"। পরে আবার বদলাইয়া "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" হইয়াছিল। এই অভিনয় আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং দীনবন্ধু নিজে উপস্থিত থাকিয়া যে প্রকার আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা ছিল না। নাট্যকার নিজে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া এই অভিনয়ের প্রত্যেক চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'লীলাবতী'র অভিনয় এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, প্রত্যেক শনিবারে ইহার অভিনয় করিতে হইত। হাজারে হাজারে দর্শক আসিত এবং ভীড় কমাইবার জন্য ও স্থান সংকুলানের জন্য, যাহারা অভিনয় বুঝিতে পারিত, কেবল তাহাদিগকে বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হইত। মজার কথা এই যে, দলে দলে লোক আসিত এবং তাহারা যে নাটকের রস-গ্রহণে সক্ষম তাহার জন্য পরিচয়পত্র দাখিল করিত। পাঁচ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির জন্য অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

স্বয়ং নাট্যকার এবং গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" দীনবন্ধুর বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ধর্মদাস সুরের প্রতিবেশী ভুবনমোহন নিয়োগী এই বইয়ের রিহার্সালের জন্য গঙ্গাতীরে একটি বাড়ি দিলেন। নীলদর্পণের অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের বিষয়ে সভ্যদের মধ্যে বিরোধ বাধিল। তাহার ফলে একটি দল ভাঙিয়া দুইটি হইল। টিকিট বিক্রয়ের পক্ষে যে দল, সে-দলের নেতা হইলেন অর্ধেন্দু; আর ইহার বিপক্ষ দলের অধিনায়ক হইলেন গিরিশচন্দ্র। লীলাবতীর অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কয়েকজন অভিনেতা বিনামূল্যে অভিনয় দেখানোর প্রথা তুলিয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহাদিগের মতে, প্রবেশ মূল্য লইয়া অভিনয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহার দ্বারা দলের অনেক দরিদ্র অভিনেতাকে সাহায্য করা যাইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের যুক্তি ছিল অন্য প্রকারের। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ প্রথা প্রবর্তন করিলে বিদেশীদের নিকট তাঁহারা হাস্যাস্পদ হইবেন, কারণ "বাঙালী" কথাটি উচ্চারণ করিতে এখনই তাঁহারা নাক সিট্‌কাইয়া থাকেন। "ন্যাশন্যাল

থিয়েটার” নাম লইয়া এইরূপ স্বল্প সাজসজ্জায় ভূষিত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আশানুরূপ টিকিট বিক্রয় হইবে না এবং তাহা না হইলে গিরিশচন্দ্রের মতে ইহা বড়ই অসাময়িক এবং পরিতাপের বিষয় হইবে। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যই গিরিশচন্দ্রের মতের বিরোধী ছিলেন বলিয়া গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার অনুগামী হইলেন রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বেণীমাধব মিত্রকে এই থিয়েটারের সভাপতি করা হইল। উড সাহেবের যে ভূমিকা গিরিশচন্দ্র লইয়াছিলেন, তাঁহা অর্ধেন্দু গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি গ্রহণ করিলেন অর্ধেন্দু, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু এবং অমৃতলাল বসু। এই সময়ে অমৃতলাল কিছুদিনের জন্য বারানসী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের গৃহ-প্রাঙ্গণটি (বর্তমানে ৩৬৮, আপার চিৎপুর রোডস্থিত মল্লিকদের “ঘড়িওয়ালা বাড়ি” নামে পরিচিত) ভাড়া করিয়া, সেখানে একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করিয়া ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর **নীলদর্পণ** অভিনয় করিলেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিন, কারণ এই দিনে এমন একটি নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক অভিনয়ের ধারার পরিবর্তন করিয়াছিল। অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং এই অভিনয়ে ৫৫০৲ টাকা প্রবেশমূল্য পাওয়া গিয়াছিল। নীলদর্পণের অভিনয় কেবলমাত্র দুই রাত্রি হইয়াছিল, তারপর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পর পর দীনবন্ধুর **জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী** এবং **বিয়ে পাগলা বুড়ো** অভিনীত হইয়াছিল। ক্রমে দীনবন্ধুর নাটক ফুরাইয়া আসিল এবং দর্শকদের মধ্যে একই নাট্যকারের নাট্যাভিনয় বিষয়ে ক্লান্তি আসিয়াছিল; তাহার ফলে টিকিট বিক্রয়ও কমিয়া গেল। ইহার পরে এই দল মধুসূদনের **কৃষ্ণকুমারী** নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ‘ভীমসিংহে’র ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে, এমন লোকের অভাব হইল। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে সকলের মনে হইতে লাগিল এবং তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করিলেন। গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতা-হিসাবে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার

শিক্ষা ও অধিনায়কত্বে 'কৃষ্ণকুমারী' ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি অভিনীত হইল এবং গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকের ভীড়ে ভরিয়া গেল এবং ইহার অভিনয় পূর্ণগৌরবে কিছুদিন চলিতে লাগিল।

আয়ের দিকটা বাড়িল বটে, কিন্তু শীঘ্রই দলের মধ্যে পরিচালনা বিষয়ে নানা প্রকার গোলমাল দেখা দিল। পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য তিনজন পরিচালক নির্বাচন করা হইল এবং সেই তিনজন পরিচালক হইতেছেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির-কুমার ঘোষ এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতেও ভিতরের ঝগড়া থামিল না এবং ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে কৃষ্ণকুমারীর প্রথম অভিনয়ের চারি মাস পরে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। এই দল ভাঙিয়া আবার দুইটি দল হইল। প্রথম দলের অধিনায়ক হইলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক হইলেন ধর্মদাস সুর। প্রথম দলে রহিলেন অর্ধেন্দু, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। দ্বিতীয় দলে রহিলেন মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অবিনাশ কর এবং রাজেন্দ্রলাল পাল। এখন হইতে প্রতিযোগিতা করাই এই দুই দলের কার্য হইল, এবং সেই প্রতিযোগিতায় বিদ্বেষভাব সমানভাবেই প্রকটিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে সুবিখ্যাত সাতুবাবুর পৌত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ নিয়মিত ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালে আগস্ট মাসে নাট্য-পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিডন স্ট্রীটস্থ সাতুবাবুর বাড়ির সম্মুখস্থ একটি টালি-ছাওয়া বাড়িতে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নাম দিয়া একটি রঙ্গালয় হঠাৎ গড়িয়া তুলিলেন। এখানে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হইল। মধুসূদনের **শর্মিষ্ঠা** ও **মায়া-কানন** এবং **উঃ! মোহন্তের এই কি কাজ!** নামক একটি চিত্ত-চমৎকারী প্রহসনের অভিনয় বেঙ্গল থিয়েটারে হইল। শেষের অভিনয়টি হইতে কোম্পানীর যে আয় হইল তাহা তখনকার দিনে অভাবনীয়।

ইতিমধ্যে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দুই বিরোধী দলের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহা মিটিয়া গেল। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দিঘাপতিয়ার রাজ-ভবনে এই দুই দলের সম্মিলিত অভিনয় হইতে। এই দুই দলের মিলন সম্ভব হইয়াছিল এমন একটি ঘটনা হইতে, যাহার ফলে একটি নূতন রঙ্গালয় স্থাপনার প্রয়োজন তখনই হইয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ —ধর্মদাস সুর ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বিরোধী দলের নেতা ভুবন নিয়োগীর সহিত বেঙ্গল থিয়েটারে 'উঃ! মোহন্তের এই কি কাজ'-এর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন; দর্শকদের ভীড় এত হইয়াছিল যে, তাঁহারা টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ দিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভুবনমোহন এতই বিরক্ত এবং হতাশ হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে একটি রঙ্গালয় খুলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রনাথ এবং ধর্মদাস তাহাদিগের পূর্ব বিরোধ ভুলিয়া এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলেন, এবং তাহার ফলে ১৮৭৩ সালে "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার" স্থাপিত হয়। এই থিয়েটার "লুইস থিয়েটার"-এর (মিসেস জি, বি, ডব্লু, লুইস নাম্মী একজন ইউরোপীয় মহিলার দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার) আদর্শে যেখানে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত সেখানে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ সালে ৩১শে ডিসেম্বর এই থিয়েটারে **কাম্য কানন** নামে প্রথম নাটকের অভিনয় হয়। এ অভিনয়ের কোন বৈচিত্র্য ছিল না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অভিনয়ের মাঝামাঝি সময়ে থিয়েটারে আগুন লাগিয়া যায়। তাঁহারা আর কোন উপায় না দেখিয়া কর্মবীর গিরিশ-চন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অবৈতনিক অভিনেতারূপে তাঁহাদের বিপন্মুক্ত করিবার জন্য নিজকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় করিবার রীতি বেঙ্গল থিয়েটার প্রবর্তন করিয়াছিল। তাহা জনপ্রিয় হওয়ায় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারেও ইহার পর ঐ রীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল।

এখন হইতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে গৌরবময় যুগের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বাঙলা নাটকের গৌরবও কম নয়। এই ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা গিরিশচন্দ্রের কর্ম-কীর্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইহার পর হইতে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস বুঝাইতে প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় অবদানকেই বুঝাইয়া থাকে। গ্রেট ন্যাশন্যালকে অনুসরণ

করিয়া যেসব নূতন প্রতিষ্ঠান জন্মাইতে লাগিল, তাহারা প্রায় সকলেই গিরিশচন্দ্রের কর্মশক্তি ও উৎসাহে বর্ধিত হইয়াছিল। নূতন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'স্টার', 'এমারাল্ড', 'সিটি', 'মিনার্ভা', 'ক্লাসিক', 'গ্রান্ড', 'নিউ ক্লাসিক', 'কোহিনূর', 'মনোমোহন' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অপত্যস্বরূপ 'অরোরা', 'ইউনিক' 'ন্যাশন্যাল', 'গ্রেট ন্যাশন্যাল', 'গ্রান্ড ন্যাশন্যাল' এবং 'থেস্‌পিয়ান টেম্পল'—এ সবই গিরিশচন্দ্রের নিকট ঋণী। গিরিশচন্দ্রের অসংখ্য গ্রন্থ এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল এবং সেইজন্যই কৃতজ্ঞ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে 'রঙ্গমঞ্চের পিতা'—এই নাম দিয়াছে।

অন্যান্য কীর্তিমান নাট্যকারেরা উন্নত ধরনের নাটক লিখিয়া এবং রঙ্গালয়কে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া যে সহায়তা দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম এখানে না করিলে অন্যায় হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে স্মরণীয় হইতেছেন রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল বসু, এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির অভাবে অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে রঙ্গমঞ্চ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে।*

* এই রচনাটি ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'দি ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি ইংরাজি প্রবন্ধ হইতে শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত। ইহা তিনি এম-এ পরীক্ষার দুইটি পত্রের পরিবর্তে 'থিসিস' হিসাবে লিখিয়াছিলেন।